KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩নং হেস্টিংস্ স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : 4/6-7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12	Year of Publication : আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৮ অগ্রহায়ণ ১৩২৮ পৌষ ১৩২৮ মাঘ ১৩২৮ ফাল্গুন ১৩২৮ চৈত্র ১৩২৮ Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২৪

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।
সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোটস প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(আশ্বিন—চৈত্র)

বিষয়		পৃষ্ঠা
অন্নচিন্তা	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত	৩২১
আচার ও বিচার	শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ	৩৪৬
আমার ধর্ম্ম	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৬৮
কংগ্রেসের দলাদলি	বীরবল	৩৫৮
গীতি-কবিতা	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৪২১
গ্রীসে ভাষার লড়াই	শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ...	৫৮০
'ঘরে-বাইরে'	শ্রীঅরবিন্দ সেন	৫৪৯
ছন্দ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৭৫
জাতীয় জীবনে সাহিত্যের উপযোগীতা	শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার ...	৬২৪
তোতা কাহিনী	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬০৮
দুখানি ফরাসী চিঠি	(শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মারফৎ প্রাপ্ত)	৪১৮
'পঞ্চক'	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৪৮২
পাত্র ও পাত্রী	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর... ...	৪৯৫
পত্র	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	৫৯২
ফরমায়েসি-গল্প	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	৭০৪
বাংলার ভবিষ্যৎ	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	৪৩৫
বাংলার বেথাপ বর্ণমালা	শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর ...	৪৬৭
বালাই	শ্রীপ্রবোধ ঘোষ	৬০৩
বাজে তর্ক	শ্রীকান্তিচন্দ্র সেন	৬৬৪

বিদ্যাপতি	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	... ৬৪৮
বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়	শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত ...	... ৪০৬
বেহিসাবের নিকাশ	শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত ...	... ৬১৭
ভদ্রতা	শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	... ৫২১
লাভালাভ	শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী ...	... ৫৪৬
শরৎ	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ...	... ৩৫৭
শক্তিমানের ধর্ম্ম	শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী...	... ৫৫৫
সুর ও তাল	শ্রীশিশির কুমার সেন...	... ৫৬৯
সাহিত্য-বিচার	শ্রীশিশির কুমার সেন...	... ৩৩৭
হৈরা	শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য	... ৬৪০

অন্নচিন্তা।

(১)

আমাদের বৈশেষিকেরা বলেছেন অভাব একটী পদার্থ। এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাক্‌লে কি আর তাঁদের চোখে পরমাণু ধরা পড়ে! আজ এই ঘোরতর অন্নাভাবের দিনে, অভাব যে একটা অতি কঠিন পদার্থ তাতে কে সন্দেহ করে? অথচ এই তত্ত্বটী প্রাচীন আচার্য্যেরা জেনে-ছিলেন, যোগবলে। কেননা সে কালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে যে অন্নাভাব ছিল না সে বিষয়ে একালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা একমত, আর বিলাতী সভ্যতাই যে দেশের সমস্ত রকম অভাবের মূল, অর্থাৎ ঐ সভ্যতার আমদানীর পূর্ব্বে যে দেশে কোনও কিছুরই অভাব ছিল না এ তো আমাদের সকলেরই জানা কথা। সুতরাং কি ঘরে কি বাইরে কোনও স্থানেই বৈশেষিক আচার্য্যেরা অভাবকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। কাজেই সে সম্বন্ধে তাঁরা যে তত্ত্বটী প্রচার করেছেন সেটী পুরাণের ভবিষ্যৎরাজবংশাবলীর মত, আর সুশ্রুতের শারীর-স্থান-বিদ্যার মত সম্পূর্ণ ধ্যানলব্ধ সামগ্রী।

কুতার্কিক লোকে হয়তো এই খানে তর্ক তুল্‌বেন যে বৈশেষিকেরা যে অভাবকে পদার্থ বলেছেন সে অভাবের অর্থ কেবল negation. আর পদার্থ মানে বস্তু নয় বিলাতী দর্শনে যাকে বলে category তাই। এবং এই তত্ত্বটীর অর্থ মাত্র এই যে অভাব বা negation মনন-

ব্যাপারের অর্থাৎ thought-এর একটা necessary ক্যাটিগরি। কিন্তু এই তর্ক আর কিছুই নয়, এ হ'ল হিন্দু দর্শনের পবিত্র মন্দিরেও ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ ঘটিয়ে তার জাত মারবার চেষ্টা। নিশ্চয় জানি কোনও খাঁটি হিন্দু এ সব তর্কে কান দেবেন না। সুতরাং এ তর্কের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রোয়োজন।

প্রাচীনকালে যে ভারতবর্ষে অন্নাভাব ছিল না তার একটী অতি নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। মাধবাচার্য্য তাঁর সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে ছোট বড় সমস্ত রকম দর্শনের বিবরণ দিয়েছেন। একটি পাণিনিদর্শনের বর্ণনা আছে যাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে ব্যাকরণ-শাস্ত্রই পরম পুরুষার্থের সাধন; ঐ শাস্ত্রের পারদর্শী না হ'লে সংসার-সাগর পারের আশা দুরাশা এবং ঐ শাস্ত্রই মোক্ষমার্গের অতি সরল রাজপথ। এমন কি একটী রসেশ্বরদর্শন আছে যাতে যুক্তি এবং শ্রুতি উভয় প্রমাণেই প্রতিপাদিত হ'য়েছে যে রস বা পারদই পরব্রহ্ম। রসার্ণব, রসহৃদয় প্রভৃতি প্রামাণিক দার্শনিক গ্রন্থ থেকে যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে; এবং রসজ্ঞেরা শুনে খুসি হবেন যে শ্রুতিপ্রমাণটী আহৃত হ'য়েছে সেটী তাঁদের সুপরিচিত "রসো বৈ সঃ রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" এই শ্রুতিবাক্য। এমন পুঁথিতেও অন্নদর্শন ব'লে কোনও দর্শনের বিবরণ দূরে থাক নাম পর্য্যন্ত নেই। এ থেকে কেবল এই অনুমানই সম্ভব যে প্রাচীনকালে এ দেশে অন্নাভাব না থাকায় অন্নচিন্তাও ছিল না, এবং বিষয়টা সম্বন্ধে একবারে চিন্তার অভাবেই এ বিষয়ে কোনও দর্শনের উদ্ভব হয় নি। কেননা ও-বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা থাক্‌লে যে তার একটা দর্শনও থাক্‌ত তাতে বোধ হয় যে প্রমাণ দেখিয়েছি তারপর আর কোনও বুদ্ধিমান লোকে সন্দেহ ক'র্‌বেন না। এবং আমার এই

যুক্তিটী যে সম্পূর্ণরূপে 'বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক প্রণালী সম্মত' তাও নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার ক'র্‌বেন।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিকের উচ্চাসন একবার গ্রহণ করেছি তখন কোনও সত্যই গোপন কর্‌লে চল্‌বে না। অপ্রীতিকর হলেও সমস্ত কথাই প্রকাশ করে বলতে হবে! অপ্রাচীন দার্শনিক যুগে (১) যে, দেশে অন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না এ বিষয়ে সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহের প্রমাণ অকাট্য। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে খুব প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক যুগে কিছু কিছু অন্নাভাব ছিল। কেননা শ্রুতিতে অন্ন সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। এর বিস্তৃত প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক! একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হতে পারে। ধরুন তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবরুণের উপাখ্যান। আমার সুপণ্ডিত পাঠকগণের অবশ্যই এই শ্রুতি-প্রসঙ্গটী জানা আছে। বরুণের পুত্র ভৃগু যখন পিতার কাছে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা করলেন তখন বরুণ তাঁকে বললেন তপস্যাদ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়, তুমি তপস্যা কর। তবে সুবিধার জন্য ব্রহ্মের সম্বন্ধে একটা 'ফরমুলা' বলে দিলেন, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি। তপস্যা করে ভৃগু জানলেন অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন থেকেই সকলের জন্ম হয়, জন্মের পর অন্নের বলেই সকলে বেঁচে থাকে, অন্নের দিকেই সকলের গতি এবং শেষে অন্নেই সবাই লীন হয়, অতএব অন্নই ব্রহ্ম। ভৃগু এই জ্ঞানটুকু লাভ করে পিতার কাছে গেলে বরুণ তাঁকে আবার তপস্যা করতে বললেন। দ্বিতীয়বার তপস্যায়

(১) আদি অন্ত ঠিক জানা না থাকলেও এই রকম যে একটা যুগ ছিল এটা জানা আছে। ম্যাক্সমুলর দেখুন।

ভৃগুর বোধ হল প্রাণই ব্রহ্ম। এই রকমে তৃতীয়বারে জানলেন মনই ব্রহ্ম। চতুর্থ বারে বুঝলেন বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। অবশেষে শেষবার তপস্যায় এই জ্ঞানে পৌঁছিলেন যে আনন্দই ব্রহ্ম। এই হল ভৃগু-বরুণের গল্প, যাকে বলে 'ভার্গবী বারুণী বিদ্যা'। এই শ্রুতি সম্বন্ধে শঙ্কর ও অন্যান্য ভাষ্যকারেরা নানা তর্ক তুলেছেন, 'পঞ্চকোষ বিবেক' নানা রকম সব দুর্ব্বোধ্য জটিলতার অবতারণা করেছেন কিন্তু এর প্রকৃত অথচ সহজ ইঙ্গিতটী কেহই ধরতে পারেন নি। এই উপাখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি এই নয় যে গোড়ায় অন্ন থাকলে তবেই শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ পাওয়া যায়! ইহাই যে শ্রুতির প্রকৃত মর্ম্ম ও শিক্ষা তাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, এবং একটু বিচার করে দেখলে বোধ হয় পাঠকেরও কোনও সন্দেহ থাকবে না। কেননা উপাখ্যানটী শেষ করেই শ্রুতি চারটী পরিচ্ছেদে কেবল অন্নেরই প্রশংসা করেছেন। এবং তার মধ্যে এমন সব শ্রুতি আছে যাতে যে-কোনও 'ইকনমিষ্টের' প্রাণ আহ্লাদে নৃত্য করে উঠবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা এই যে উপাখ্যানটী পড়লেই বিংশশতাব্দীর সভ্যতার উজ্জ্বল আলোতে ওর প্রকৃত অর্থটা স্পষ্ট ধরা পড়ে; এবং শঙ্কর প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকেরা কেন যে ওর যথার্থ মর্ম্ম বুঝতে পারেন নি তার কারণও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। পূর্ব্বেই প্রমাণ করেছি যে ঐ সব দার্শনিকদের সময়ে কোনও অন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না। এবং তাঁদের যে কোনও historical sense বা 'ঐতিহাসিক অনুভূতি' ছিল না তা যাঁর ঐ sense বিন্দুমাত্র আছে তিনিই জানেন। সেইজন্য বৈদিক সময় যে তাঁদের সময়ের চেয়ে কিছুমাত্র অন্য রকম ছিল এটা তাঁরা কল্পনাই করতে পারতেন না। ফলে বর্ত্তমান কালে

আমরা যে higher criticism বা 'উচ্চতর অঙ্গের সমালোচনার' বলে প্রাচীনকালের মনের কথাটা একবারে ঠিকঠাক বুঝে নিতে পারি, শঙ্কর প্রভৃতির সে সামর্থ্য ছিল না। অবশ্য ঐ সমালোচনা-প্রণালীর নামের higher বিশেষণটা যাঁরা ও-প্রণালীটা প্রবর্ত্তন করেছেন তাঁরাই দিয়েছেন, কিন্তু সত্যের খাতিরে বিনয়কে উপেক্ষা করবার মত সৎসাহস তাঁদের সকলেরি ছিল।

যা হোক পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনার ফলে এটা বেশ জানা গেল যে বৈদিক সময়ের পরে আর অন্নচিন্তায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বড় মাথা ঘামান নি। তাঁরা ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছেন এবং কামসূত্রেরও অনাদর করেন নি, কিন্তু মাঝখান থেকে অন্নসূত্রটা একেবারে বাদ দিয়েছেন। এর ফলভোগ করছি আমরা, তাঁদের এ যুগের বংশ-ধরেরা। আমাদের অন্নের অভাব অত্যন্ত বেশী, এবং কিসে ও বস্তুটার কিছু সংস্থান হয় তার একটা মোটামুটী রকম মীমাংসারও বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু বহুযুগের বংশাক্রমিক অনভ্যাসের ফলে ও-সম্বন্ধে চিন্তা বা আলোচনা করতে গেলেই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন আমরা কে যে কি বলি তার কিছু ঠিক থাকে না। সেইজন্য আমাদের বাঙ্গালা-দেশে দেখা যায়, যিনি আইনের বিদ্যা ও বক্তৃতা বেচে টাকা জমিয়েছেন, তিনি সভায় দাঁড়িয়ে বাঙ্গালীর ছেলেকে ইস্কুল কলেজে বৃথা সময় নষ্ট না করে চট্‌পট্ ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে যেতে খুব জোরাল বক্তৃতা দেন। অবশ্য সেই ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলধনের জন্য তাঁর জমান টাকার কোনও অংশ পাওয়া যাবে না, কেন না তাঁর যে বংশধর ওকালতি করবে কিন্তু উপার্জ্জন করবে না তার জন্য সটা সঞ্চিত থাকা নিতান্ত দরকার। এবং বলা বাহুল্য, যে শিল্প-

বাণিজ্যে না ঢুকে লেখাপড়া শিখে চাকুরী খুঁজে বেড়ায় বলে বাঙ্গলার যুবকেরা লেখায় ও বক্তৃতায় হিতৈষিদের গঞ্জনা শুনছে, সেই শিল্প ও বাণিজ্য দেশের কোথায় যে তাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে সেটা তাদের দেখান কেউ প্রয়োজন মনে করি নে। ভাবটা এই যে নাইবা থাকুল বাঙ্গালীর ছেলের মূলধন নাই বা থাকুল দেশে তাদের জন্য কোনও শিল্প-বাণিজ্য, তারা কেন প্রত্যেকেই বিনা মূলধনে আরম্ভ করে নিজের চেষ্টায় এক একটা শিল্পের বড় বড় কারখানা গড়ে তোলে না, বড় রকম ব্যবসার মালিক হয়ে বসে না। কেননা কোনও কোনও দেশে কোনও কোনও লোক যে কদাচিৎ ঐ রকম ব্যাপার করেছে, তা ত পুঁথিতেই লেখা আছে। তারপর আমাদের এই অন্ন-সমস্যার সমাধানের জন্য স্কুল কলেজ সব তুলে দিয়ে সে জায়গায় কৃষিপরীক্ষাশালা ও শিল্প-বিদ্যালয় খোলাই যে একমাত্র উপায় সে বিষয়ে কেউ যুক্তি-তর্ক দেখান; আর যাঁরা কাজের লোক তাঁরা যে হয় কোনও ছেলেকে, যা-হোক কিছু একটা শিখে আসবার জন্য, যে একটা হোক বিদেশে যাওয়ার জাহাজ-ভাড়া সাহায্যের জন্য চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর করাতে আরম্ভ করেন। আর এ যুগের বাঙ্গালীর ছেলেও হয়েছে এক অদ্ভুত জীব। বর্ত্তমানে ধনেজনে যে জাতি পৃথিবীর মাথায় বসে আছেন শোনা যায়, বুকের মধ্যে তাঁদের হৃৎ-পিণ্ডে পৌঁছিতে হ'লে তাঁদের গায়ের জামার অংশবিশেষের ভিতর দিয়াই তার সোজা, এবং মন্দ লোকে বলে একমাত্র পথ। বাঙ্গালীর ছেলের অবস্থাটা ঠিক উল্টো। নিজের পকেট সম্বন্ধেও খুব বেশী সজাগ ও উৎসাহান্বিত করতে হলে, এদের একেবারে বুকের মধ্যে ঘা না দিলে কোনই ফল পাওয়া যায় না। দেশী শিল্পকে উৎসাহ

দেওয়া যে দেশের ধনবৃদ্ধির ও ধনরক্ষার জন্য একটা 'টারিফের' প্রাচীর মাত্র, 'পলিটিকাল ইকনমি' নামক বিজ্ঞান শাস্ত্রের যুক্তি-তর্ক এবং মহাজনের খাতার হিসাব-নিকাশেরই বিষয়, তা এরা কিছুতেই বুঝতে চায় না, এবং বুঝলেও তাতে কোনও ফল হয় না। এরা চায় গান আর কবিতা যার বিষয় হচ্ছে দেশের উত্তরের হিমালয়ের মাথার বরফের মুকুট, দক্ষিণের নীল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, এবং যখন সমস্ত পৃথিবী মূক ছিল তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সাম-গানে সিন্ধু স্বরস্বতীর তীর ধ্বনিত করেছিলেন, সেই কাহিনী। অথচ এরা যে হাতে কলমে কাজে লাগতে পারে না বা কাজ উদ্ধার করতে পারে না, এমন নয়। এরা অর্দ্ধোদয়-যোগে দেশের দীনতমকেও নারায়ণের পূজায় সেবা করে এবং শৃঙ্খলার সঙ্গেই করে; বন্যার জলে চালের বস্তা পিঠে নিয়ে সাঁতার দেয়, এবং কোনও 'ডিপার্টমেণ্টের,' বিনা চালনায় অনুষ্ঠানটী যেমন করে' নির্ব্বাহ করে, তাতে কাজের চেয়ে কাজের শৃঙ্খলাই যাদের গর্ব্বের প্রধান বিষয়, সেই 'ডিপার্টমেণ্টের' কর্ত্তাদেরও কতক বিস্ময় কতক সন্দেহের উদ্রেক হয়; জাতির একটা দুর্নাম ঘোচাবার জন্য এরা তুর্কীর গুলিতে টাইগ্রিসের পারে প্রাণ দিতে রাজী হয়, এবং তার শিক্ষানবীশিতে পুব-পশ্চিমের কোনও জাতির চেয়ে কম পটুতা দেখায় না। কিন্তু এ ত অতি স্পষ্ট যে এ সকলি কেবল ভাবের খেলা, এর মধ্যে বস্তুতন্ত্রতা কিছুই নেই। প্রকৃত কাজের বেলায় এদের চরিত্রে কোনও গুণই দেখা যায় না। এরা কিছুতেই উপলব্ধি করে না যে খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও একনিষ্ঠার সঙ্গে আরম্ভ করে, সংসারযুদ্ধে জয়ী হ'য়ে দশের এক হওয়াই সব চেয়ে বড় কাজ, চরিত্রের সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। সেইজন্য যদিও

বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার পুঁথিতে এদের সেই সব মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান হয় যাঁরা খুব হীন অবস্থা থেকে পরিশ্রম, অধ্যবসায় প্রভৃতি বহু সৎগুণের সদ্ব্যবহারে নিজেদের অবস্থা খুব বেশীরকম ভাল করেছিলেন; এবং ইংরেজী হাতের লেখা লিখ্‌তে আরম্ভ করেই সময় আর টাকা যে একই জিনিষ 'কপিবুক' থেকেই এরা সে অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ করে, তবুও কিছু বড় হ'লেই এই পুস্তকস্থ-বিদ্যার ফল এদের স্বভাবে কিছু দেখা যায় না। তখন বাল্যশিক্ষার পুঁথির মহাজনদের অনুরূপ যে সব কৃতকর্ম্মা পুরুষ, সমাজে সশরীরেই বর্ত্তমান এরা তাঁদের কোনও খবরই রাখে না, এমন কি তাঁরা দেশের রাজার কাছে খুব উঁচু সম্মান পেলেও নয়। যারা কেবল কথার সঙ্গে কথা গাঁথ্‌তে পারে, বা লজ্জাবতীর পাতায় তামার তার জড়ায়, এরা তাদের নিয়েই অসঙ্গত রকম হৈ চৈ করে। অন্নচিন্তায় যে এরা কাতর নয়, কি অন্নচেষ্টা যে এদের উদ্বেজিত করে না তা নয়। সে চিন্তায় এরা যথেষ্টই ক্লিষ্ট; সে চেষ্টায় এরা অনেক দুঃখ অনেক অপমানই সহ্য করে। কিন্তু সে সব সত্বেও ঐ চিন্তা আর ঐ চেষ্টাকেই পরমোৎসাহে সমস্ত মন দিয়ে বরণ করে' নিতে কিছুতেই এদের মন সরে না। এদের ভাব কতকটা এইরকম যে রোগ যখন হয় তখন ডাক্তারও ডাক্‌তে হয়, ঔষধও গিলতে হয় এবং হাঙ্গামও কিছু কম হয় না। এবং যে চিররোগী, সমস্ত জীবনই বাধ্য হ'য়ে তাকে এই হাঙ্গাম সইতে হয়। কিন্তু তাই বলে রোগের চিকিৎসাকেই সব চেয়ে বড় উৎসাহের ব্যাপার করে তোলা সম্ভবপর নয়।

আমরা বাঙ্গালা দেশের ছেলে বুড়ো অন্নচিন্তার ব্যাপারে সবাই যে এই সব আশ্চর্য্য ও অস্বাভাবিক কাণ্ড করি, পূর্ব্বেই বলেছি এতে

আমাদের দোষ, কিছু নেই। দোষ পূর্ব্বপুরুষদের যাঁরা ও-সম্বন্ধে সুচিন্তা ও মনের কোন স্বাভাবিক ঝোঁক রক্ত-মাংসের সঙ্গে আমাদের দিয়ে যেতে পারেন নি। এই দায়িত্বহীনতার সাহসেই এই প্রবন্ধও সুরু করেছি। কেননা জানি বেফাঁস কথা যা কিছু ব'লবো তাতে আমার নিজের দায়িত্ব কিছুই নেই। দায়ী সেই পিতৃপুরুষেরা যাঁরা পিণ্ডের আশা করেন কিন্তু পিণ্ডের অন্ন সম্বন্ধে একনিষ্ঠ হ'য়ে চিন্তা করবার মতন মনের বা মগজের অবস্থা নিজেদের না থাকায় আমাদেরও দিয়ে যেতে পারেন নি।

(২)

দেশের প্রাচীন আচার্য্যেরা যখন অন্ন সম্বন্ধে চিন্তাই করেন নি, তখন সে চিন্তায় কিছু সাহায্য পেতে হ'লে পশ্চিমের আধুনিক যবনাচার্য্যদের কাছেই যেতে হয়। এঁদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা অন্ন-জিজ্ঞাসারই একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়ে তুলেছেন। কিন্তু অন্ন সম্বন্ধে যিনি সব চেয়ে ব্যাপক অথচ গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন তিনি এই অন্ন-শাস্ত্রের শাস্ত্রী নন তিনি একজন প্রাণতত্ত্ববিদ্ আচার্য্য, নাম চার্লস্ ডারুইন। ভৃগু-বরুণ-প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে অন্ন-তত্ত্বের এক ধাপ উপরে উঠলে পাই প্রাণতত্ত্ব। সুতরাং প্রাণতত্ত্বজ্ঞ ডারুইন যে তাঁর উপরের ধাপ থেকে অন্নের লীলা ব্যাপকতর ও স্পষ্টতর ভাবে প্রত্যক্ষ করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ডারুইন পূর্ব্বাচার্য্যদের কাছে থেকেই অন্নপ্রাণ-বিদ্যার এই বীজ মন্ত্রটী পেয়েছিলেন যে পৃথিবীতে যত প্রাণী জন্মে তাদের সকলের প্রাণ

রক্ষার উপযোগী পর্য্যাপ্ত অন্ন বসুমতি যোগাতে পারেন না। কিন্তু এই প্রাচীন মন্ত্রই বহু বৎসর ধরে একান্ত নিষ্ঠা ও কঠোর সংযমের সঙ্গে জপ করতে করতে পূর্ব্বে যা কারও ভাগ্যে ঘটে নি তাঁর সেই সিদ্ধি লাভ হ'ল। অন্ন তাঁর অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ ডারুইনকে দেখালেন। তিনি দেখলেন স্থলে, জলে, আকাশে—অরণ্যের ছায়ায়, মরুভূমির প্রান্তে, গাছের শাখায়, পর্ব্বতের গহ্বরে, সমুদ্রের তলে, হ্রদের বুকে—অন্নের জন্য প্রাণের এক অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব চলেছে। অন্ন পরিমিত, তার আকাঙ্ক্ষী জীব সংখ্যাহীন। এই পরিমিত অন্নকে আয়ত্ত করার জন্য প্রাণীতে প্রাণীতে, উদ্ভিদে উদ্ভিদে, উদ্ভিদে প্রাণীতে যে দ্বন্দ্ব, তা যেমন বিরামহীন তেমনি মমতাহীন। এ দ্বন্দ্বে কেহ কারও সহায় নয়। এ হ'ল সকলের সঙ্গে প্রত্যেকের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব কখনও প্রকাশ হচ্চে প্রকাশ্য যুদ্ধের রক্তোচ্ছ্বাসে, কখনও নিঃশব্দে চলেছে নীরব প্রতিযোগিতার আকারে। কোনটা বেশী ভয়ানক বলা কঠিন। অন্ন তাঁর মোহিনী মূর্ত্তিতে প্রাণকে আকর্ষণ করেছেন, আর আকৃষ্ট প্রাণীকে মহাকালের মূর্ত্তিতে সংহার করছেন। শেষ পর্য্যন্তও যাদের উপর প্রসন্ন দৃষ্টি রাখছেন সেই ভাগ্যবানদের সংখ্যা অতি সামান্য। মৃত্যুর মরুভূমির উপর দিয়ে অন্ন তাঁর সম্মোহন শঙ্খ বাজিয়ে চলেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণের জোয়ারে দুকূল ছাপিয়ে উঠছে, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস দু'পাশের তপ্ত বালুতেই শুষে নিচ্ছে। প্রাণের একটা অতি ক্ষীণ ধারা কোনও রকমে শেষ পর্য্যন্ত অন্নের পিছনে পিছনে চলেছে।

অন্নের এই মোহিনীমহাকালের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করে ডারুইন কাল জয় করে অমর হয়েছেন। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে অন্নের লীলার এখানেই শেষ নয়। প্রাণের ধারা চলতে চলতে একদিন মানুষে এসে

ঠেকল। পৃথিবীতে প্রাণের ক্রমবিকাশ হ'তে হ'তে একদিন তা মানুষের মূর্ত্তি নিয়ে প্রকাশ হ'ল। কেমন ক'রে হ'ল সে কথা পণ্ডিতদের তর্ককোলাহলে অপণ্ডিতসাধারণের কানে আসা দুঃসাধ্য; তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এবার যে বিগ্রহে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হল, সে বিগ্রহ অতি মনোরম, অতি বিস্ময়কর। তার সুঠাম, সরল, উন্নত দেহ, তার বন্ধনহীন মুক্ত বাহু, তার সতেজ ইন্দ্রিয়, তার সবল, অনাড়ষ্ট মাংসপেশী সবই যেন স্পষ্ট করে বলে দিল যে এ বিগ্রহ অরণ্যে পড়ে থাকবার নয়, এর জন্য একদিন সোণার দেউল গড়া হবেই হবে। তবুও প্রাণের এই প্রকাশের সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার তার এই মূর্ত্তি নয়। তার চেয়েও লক্ষগুণে আশ্চর্য্য এক ব্যাপার সংঘটিত হল। যে মন বোধ হয় পৃথিবীতে প্রাণের যাত্রারম্ভের সঙ্গেই তার সাথে ছিল, অতি ক্ষীণ অদৃশ্যপ্রায় অবস্থা থেকে নানা মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে অতি ধীরে ধীরে ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, মানুষের মূর্ত্তিতে পৌঁছে সে একবারে দীপ্ত সূর্য্যের মতন জ্বলে উঠল। তার উজ্জ্বল দীপ্তিতে মানুষ পৃথিবার দিকে চেয়ে দেখল যে এ বিপুল ধরিত্রী তারি রাজত্ব।

অন্ন তাঁর নিজের শক্তি সেইদিন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করলেন যেদিন এই মানুষও রাজটীকা ললাটে নিয়ে কাঙালের মত তাঁর পিছু পিছু পৃথিবীময় ছুটে বেড়াতে লাগল। একটা ফলের জন্য দশটা গাছের তলায়, একটা শিকারের খোঁজে এক অরণ্য হতে আর এক অরণ্যে ঘুরে ঘুরে পরে অন্নকে কিছু সুলভ করে একটু সুস্থির হওয়ার চেষ্টায় গোটাকয়েক প্রাণীকে যদি পোষ মানাল, তবে সেই প্রাণীরূপ অন্নের অন্ন খুঁজতে এক দেশ হতে আর এক দেশে চলতে চলতে তার পায়ে ব্যথা ধরে উঠল।

এই অজ্ঞাতবাসের দুঃসহ দৈন্যে মানুষের বহু যুগ কেটে গেল। শেষে একদিন পরম শুভক্ষণে ক্লান্তদেহ, ক্ষুব্ধচিত্ত মানুষ বলে উঠল আর অন্নের আশায় তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াব না,—অন্নকে সৃষ্টি করব, স্বল্প অন্নকে বহু করব। সেদিন নিশ্চয়ই স্বর্গের তোরণে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠেছিল; দিব্যাঙ্গনারা মর্ত্ত্যচক্ষুর অদৃশ্য হেমঘটে অভিষেক-বারি এনে মানুষের মাথায় ঢেলেছিলেন; ইন্দ্রদেব এসে সোণার রাজমুকুট তার মাথায় পরিয়েছিলেন; আর সমস্ত আকাশ ঘিরে দেবতারা প্রসন্ন নেত্রে দীর্ঘ বনবাসের পরে মানুষের নিজ রাজ্যে অভিষেক চেয়ে দেখেছিলেন।

কৃষি আরম্ভ হল। প্রাণের ধাপ থেকে মনের ধাপে উঠে মানুষ দেখল যে এখানে দাঁড়ালে অন্ন এসে আপনিই হাতে ধরা দেয়, তাকে পৃথিবীময় খুঁজে বেড়াতে হয় না। এখানে বসে তপস্যা করলে কালো মাটীর বুক চিরে সোণার ফসল বাইরে এসে পৃথিবী ঢেকে ফেলে; দিনের অন্ন দিন খুঁজে প্রাণান্ত হতে হয় না। মানুষ জানল, 'পৃথিবী বা অন্নম্', পৃথিবীই অন্ন। মাটীর তলে জলের অফুরন্ত ধারার মত মাটীর মধ্যে অন্নেরও অফুরন্ত ভাণ্ডার লুকান আছে; লাঙ্গলের ফালে তাকে তুলে আনতে জানলে অন্নের দৈন্য দূর হয়; যে মন্ত্র ডারুইন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার শক্তিকে ব্যর্থ করা যায়। মাটীর সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন হল। মাটীর টানে উদ্‌ভ্রান্ত বনচারী গৃহী হল। সেইদিন মানুষের স্বদেশ, সমাজের প্রতিষ্ঠা হল, মানুষের গ্রাম নগর গড়ে উঠল, শিল্প বাণিজ্যের সুরু হল। পৃথিবীর আদিম অরণ্য কেটে সভ্যতার সোনার মন্দিরে মানুষের প্রতিষ্ঠা হল।

কিন্তু প্রাণের ভূমি থেকে আরম্ভ করে' মানুষের এই যে যাত্রা এখানেই তার শেষ হয় নাই। মন যখন সৃষ্টির ক্ষমতায় পরিমিত অন্নকে বহু করে' অন্নের দাসত্বের লোহার বেড়ি মানুষের পা থেকে খুলে নিল, বিরামহীন অন্নচেষ্টা থেকে তাকে মুক্তি দিল, তখনই মানুষের স্বভাবের যেটি পরমাশ্চর্য্য অংশ, সেটির বিকাশ হ'ল। মানুষ দেখ্‌ল যে কেবল অন্নে তার তৃপ্তি নাই,—তার পরিমাণ যতই অপর্য্যাপ্ত হ'ক, তার প্রকার যতই বিবিধ হ'ক। প্রাণের তাড়নায় অন্নের খোঁজে আকাশ, বাতাস, পৃথিবীকে জান্‌তে আরম্ভ করে' মানুষ বুঝ্‌ল যে তার স্বভাবে একটা কি আছে যেটা কেবল জানার দিকে তাকে ঠেলে দেয়। অন্নের সৃষ্টি আরম্ভ করে' সে জান্‌ল যে তার প্রকৃতির যেটা অন্তরতম অংশ সেটা কেবল সৃষ্টির আনন্দেই সৃষ্টি করে' যেতে চায়। মানুষ যেন প্রাণিরাজ্যের রাজা হলেও অপ্রাণ লোকেরই অধিবাসী। সে যেন বিদেশী রাজপুত্র পরদেশে এসে রাজত্ব পেয়েছে, কিন্তু তার অন্তরাত্মার নাড়ীর টান স্বদেশের দিকেই। প্রাণের জগতে মানুষের এই যে উদ্দেশ্যহীন জানা আর অনাবশ্যক সৃষ্টি তাই হ'ল তার বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, কাব্য, কলা, শিল্প। মানুষের প্রাণ বলে এদের মূল্য এক কানা কড়িও নয়; তার অন্তর জানে এরাই তার যথা সর্ব্বস্ব, অন্নের চেয়েও কাম্য, প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

এই হ'ল মানুষের সভ্যতার অন্ন আর প্রাণের ভূমি থেকে মনের সিড়ি দিয়ে বিজ্ঞান আর আনন্দলোকে যাত্রার ভ্রমণ-কাহিনী। এই লোকে পৌঁছিলেই অন্নের দাসত্ব থেকে মানুষের যথার্থ মুক্তি। মানুষ যদি কেবল অন্নকে আয়ত্ত করেই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ত তা হ'লে অন্ন দাস হলেও মানুষের জীবনে তার সর্ব্বব্যাপী প্রভুত্বের কোনও

অপচয় হ'ত না। সোনার শিকলে অন্নকে বাঁধলেও শিকলের অন্য দিকটা মানুষের গলাতেই পরান থাক্‌ত, অন্নের টানে পৃথিবীময় না ঘুরতে হলেও সারাক্ষণ অন্নকে টেনেই পৃথিবীতে চল্‌তে হ'ত। এই বিজ্ঞান আর আনন্দলোকে পৌঁছিতে জানলেই মানুষের গলা থেকে এই অন্নের শিকল খোলার উপায় হয়। আমাদের ঋষিরা সংসারচক্র থেকে জীবের মুক্তির কথা বলেছেন। এই হ'ল মানুষের সভ্যতার অন্নচক্র থেকে মুক্তির পথ।

(৩)

যদি কারু মনে হয় যে মনের বলে মানুষের আয়ত্ত হয়ে, তাকে বিজ্ঞান আর আনন্দের পথের যাত্রী দেখে, মানব-জীবনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে', অন্ন চিরদিনের জন্য নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছে তবে তিনি অন্নের প্রভাব এবং মাহাত্ম্যের কথা কিছুই জানেন না। মানুষের সভ্যতার যে মুক্তির কথা বলেছি সে হ'ল শাস্ত্রে যাকে বলে জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ দেহও আছে, মুক্তিও হয়েছে। সুতরাং মানুষের দেহ আর প্রাণ যতদিন আছে তখন তার অন্নের উপর একান্ত নির্ভর আছেই আছে। এই ছিদ্র ধরে অন্ন অতি নিপুণ সেনাপতির মত এক নূতন পথ দিয়ে তার বল চালনা করে' মানুষকে বন্দী কর্‌বার চেষ্টা করেছে। প্রাচীন দ্বন্দ্বটা চলেছে, কেবল আবস্থার পরিবর্ত্তনে 'ট্রাজেডির' প্রভেদ ঘটেছে মাত্র।

যতদিন মানুষ কেবল প্রাণী ছিল, তার মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নি, বিজ্ঞান ও আনন্দলোকের বার্ত্তা তার অজ্ঞাত ছিল, ততদিন অন্নের দৃষ্টি ছিল মানুষের প্রাণের উপর। যেমন ইতর প্রাণীকে তেমনি

মানুষকেও নিজের রথের চাকায় বেঁধে, অন্ন তার জীবন-মৃত্যুর উপর কর্ত্তৃত্ব করত। এই যুদ্ধে অন্ন জয়ী হয়েছিল নিজেকে বিরল করে, আপনাকে দুর্লভ করে। মানুষের মন যখন অন্নকে বহু ও সুলভ করে এই উপায়টা ব্যর্থ কর্‌ল সেইদিন থেকে অন্নের দৃষ্টি পড়েছে মানুষের বিজ্ঞান ও আনন্দলোকের দিকে। অন্ন জানে যে ওরাই তার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী। মানুষের জীবনে যদি ওদের আবির্ভাব না হত, তাহলে নামে প্রভু হলেও রোমের শেষ সম্রাটদের মত মানুষ দাস-অন্নের দাসত্বই করত। কাজেই অন্নের এখন চেষ্টার বিষয় হয়েছে মানুষের সভ্যতার ঐ বিজ্ঞান আর আনন্দের লোকটা ধ্বংশ করা। আর প্রাণকে আয়ত্ত করার প্রাচীন চেষ্টার ব্যর্থতার মধ্যেই অন্ন এই নূতন যুদ্ধের অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে। দুর্লভ অন্নকে বহু করে মানুষ সভ্যতা গড়েছে। এই বহু অন্ন অসংখ্য মোহিনী মূর্ত্তিতে মানুষকে ঘিরে তার বিজ্ঞান আর আনন্দলোকের পথরোধের চেষ্টা করছে। বিরলতার ক্ষয়রোগে মানুষের সভ্যতাকে ধ্বংশ করতে না পেরে বাহুল্যের মেদরোগে তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াটা বন্ধ করবার চেষ্টা দেখছে। অন্ন এখন মহাকালের মূর্ত্তি ছেড়ে কুবেরের মূর্ত্তি ধরেছে। মানুষের কত সভ্যতা মহাকালের করাল দংষ্ট্রা হতে উদ্ধার পেয়ে স্থূলোদর ভোগপ্রসন্নমুখ কুবেরের মেদপুষ্ট বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে নিশ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরেছে!

মানুষের সভ্যতার সঙ্গে অন্নের এই দ্বন্দ্ব নূতন নয়, এ দ্বন্দ্ব অতি প্রাচীন। সভ্যতার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এ দ্বন্দ্বেরও আরম্ভ হয়েছে এবং বোধ হয় শেষ পর্য্যন্তই চলবে। কখনও সভ্যতা জয়ী হয়েছে, কখনও বা অন্নেরই জয় হয়েছে। মানুষে মানুষে শেষ যুদ্ধের বর্ত্তমান

কল্পনার মত এ যুদ্ধের শেষ কল্পনাও হয়ত কেবল স্বপ্ন। হয়ত মানুষের সভ্যতাকে চিরদিনই এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উঠে পড়ে চলতে হবে।

এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যে মানুষের সভ্যতা রক্ষা পেয়েছে কেননা যুগে যুগে এমন সব জাতি উঠেছে যারা অন্নের মায়াকে অতিক্রম করে আনন্দের পথে চলতে পেরেছে। ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস আধুনিক বাঙ্গালী সেই সব জাতির অন্যতম। সভ্যতার এই প্রাচীন যুদ্ধে নবীন সেনাপতি হবার যোগ্যতা এদের মধ্যে আছে। অন্নের মহাকাল-মূর্ত্তিতে ভয় পেয়ে যাঁরা এই জাতিকে কুবেরের কোলে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান, তাঁদের মাথায় বুদ্ধি থাকতে পারে, কিন্তু চোখে দৃষ্টির অভাব। আনন্দলোকের সূর্য্যরশ্মি বিজয়-মাল্যের মত এদের মাথায় এসে পড়েছে; হিতৈষিদের শত চেষ্টাতেও সে বরণকে উপেক্ষা করে কেবল অন্নকে বহু করার চেষ্টাতেই এ জাতি কখনও জীবন উৎসর্গ করতে পারবে না।

"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ"; অন্নের নিন্দা করি নে। "অন্নং বহুকুর্ব্বীত"; অন্নকে বহু করার যে কত প্রয়োজন তাও জানি। সেই ভিত্তির উপরেই মানুষের সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। সমস্যা এই, কেমন করে অন্নকেও বহু করা যায় আবার তার বাহুল্যকেও বর্জ্জন করা যায়। মহাকালের দংশনেও ছিন্ন হতে না হয়, কুবেরের গদাও চূর্ণ না করে।

এস নূতন যুগের নবীন বাদরায়ণ! 'অথাতোঽন্ন জিজ্ঞাসা' বলে তোমার অন্নসূত্র আরম্ভ করে এই সংশয়ের সমাধান কর। কোন মধ্যযান পথের পথিক হলে মানুষের সভ্যতাকে আর আনন্দের ব্রহ্ম-লোক হতে ফিরে আসতে না হয় তার নির্দ্ধারণ কর।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

সাহিত্য-বিচার।

—*—

যে দু'দিক হতে বাংলা সাহিত্য বিচার করা হয়ে থাকে, তা হচ্চে ভাষা ও নীতি; আর, যে দু'দিক সাধারণত উপেক্ষিত হয়ে থাকে, তা হচ্ছে ভাব ও শিল্প।

ভাষা সম্বন্ধে উভয় দলের বক্তব্য একপ্রকার নিঃশেষিত হয়েছে বলে মনে হয়;—এখন যা চলেছে তা হচ্ছে নিছক গালি। আর গালিটা যে কোনদিক হতে বর্ষিত হচ্ছে তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়, কারণ নিশ্চিত-অপরাধীকে দেখিয়ে দিলেও অনিরপেক্ষতা দোষে দোষী হতে হয়। সাহিত্যবিচার যখন ব্যক্তিগত নিন্দায় পর্য্যবসিত হয়, তখন শুধু সাহিত্যের নয়, সমাজেরও দুঃসময়, কারণ সমাজ ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতাসম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক।

ভাষা নিয়ে এই যে বিতণ্ডাটা হচ্ছে, এর ভিতর যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বিস্ময়াবিষ্ট করে, তা হচ্ছে ভাষার সীমালঙ্ঘন নিয়ে তর্ক। পুথির ভাষার প্রকৃতি কিপ্রকার হওয়া উচিত—তা নিয়ে তর্ক সম্ভব হলেও, শব্দসংখ্যা নির্দ্দেশ করতে যাওয়া যার-পর-নাই বিস্ময়কর ব্যাপার। বাংলা ভাষা প্রাকৃত হলেও, প্রকৃত হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি থাকতে পারে না। সংস্কৃতের রাজ্য হতে সে যদি শব্দ এনে বেমালুম হজম করতে পারে, তবে সেটা তার প্রকৃতিগত, এবং প্রাণধারণের অবশ্যম্ভাবী ফল। ভাষাকে দুর্ব্বচনীয় করতে নব্যপন্থীদের আপত্তি

থাক্‌লেও, উহাকে অনির্ব্বচনীয় করতে তাঁদের কোনো আপত্তি পরিলক্ষিত হয় না। তাঁদের তর্কের বিষয় হচ্ছে ভাষার সচলতা, তাকে মন্থরতা থেকে মুক্তি দিয়ে ক্ষিপ্র, সতেজ, চতুর করা। ইংরাজী যদি Anglo-Saxon ভাষা হত, তবে তা কখনই এত সম্পদশালী হতে পারত না। Norman Conquest-এর ফলে যখন অজস্র Norman শব্দ তাদের নানা অর্থ-বৈচিত্র্য নিয়ে তার ভিতরে প্রবেশ করলে, তখন তার ঐশ্বর্য্যের সীমা রইল না, এবং সে ভাষা Anglo-Saxon ও রইল না, Norman ও হল না—হল বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষা। বাংলা তেমনি প্রাকৃতও নয়, সংস্কৃতও নয়—তা বাংলা।

তারপর নব্যসাহিত্যে দুর্নীতি দেখে যাঁরা এতটা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন যে, লেখকদের কশাঘাত করা আবশ্যক মনে করেন তাঁদের শাসনে যে দেশের কল্যাণকামনা অন্তর্নিহিত রয়েছে তা নিঃসন্দেহ; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ঐ দুর্নীতি যে কাল্পনিক, তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করবার ধৃষ্টতা আশা করি মার্জ্জনীয়।

নীতির ক্ষেত্রে ইভল্যুসনের নিয়ম কার্য্য করে কিনা, বা কোনও বিশেষ নীতিশাস্ত্র চিরধ্রুব থাকতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে প্রথমে কিছু না বলে,—নব্যসাহিত্যে বর্ত্তমান নীতির সীমা কোথায় লঙ্ঘিত হয়েছে, তা দেখা যাক। "ঘরে বাইরে" দৃষ্টান্তস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। "ঘরে বাইরের" ভিতর কেহ কেহ বর্ত্তমান সমাজভিত্তির ভাবী টলটলায়মান অবস্থা দেখে সচকিত হয়ে পড়েছেন, এবং লেখনীর সাহায্যে সম্ভব না হলে, লগুড়ের সাহায্যে এ "কালাপাহাড়কে" সাহিত্য হতে বহিষ্কৃত করতে কৃতসংকল্প হয়েছেন। উদ্দেশ্য তাঁদের সাধু। কিন্তু বঙ্গনারীর সম্মুখে কবি কি বিমলাকে আদর্শস্বরূপ দাঁড় করিয়েছেন, না বঙ্গযুবকের

কাছে সন্দীপকে আদর্শ নায়করূপে স্থাপন করেছেন? সন্দীপ ও বিমলার বন্ধনহীনতা—যাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলা হয়েছে—কি নিখিলেশের উদারতা, ত্যাগ, প্রেম ও সংযমকে সমধিক মহিমান্বিত করছে না? "ঘরে বাইরে" পড়ে একজন সরল পাঠক বলেছেন, "সন্দীপকে ঘর থেকে বের করে দিলেই তো এ সব হিজিবিজির সৃষ্টি হত না"! নিজের স্নিগ্ধজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হয়ে কে আদর্শরূপে আমাদের কাছে দাঁড়াচ্ছে?—নিখিলেশ। বিরাগী না হয়ে ত্যাগদ্বারা ভোগকে কে মহিমান্বিত করছে?—নিখিলেশ। মৃত্যু অপেক্ষাও দারুণ বিপদের সম্মুখে কে স্থির, সমাহিত?—নিখিলেশ। আদর্শ কে?—নিখিলেশ।

সমাজে স্ত্রীপুরুষের যথার্থ সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা পৃথিবীব্যাপী, এবং সত্য সম্বন্ধ এখনো নির্ণীত হয় নি। তবে স্ত্রীর ব্যবহার সম্বন্ধে দায়িত্বের ভারটা স্ত্রীর স্কন্ধে চাপানোটাই যে স্বাভাবিক, এ সহজ কথাটি তাঁদের বুঝতে কষ্ট হয় নি, কারণ তা নাহলে স্ত্রীজাতির মনুষ্যত্বকে একেবারেই খর্ব্ব করা হয়। বার্ণার্ডশ তাঁর "Irrational Knot"-এ এ সত্যটি সুন্দররূপে পরিস্ফুট করেছেন। সুতরাং দায়িত্ববোধ জাগ্রত রাখতে হলে, কার্য্যক্ষেত্রে মুক্তিপ্রদানও আবশ্যক। স্ত্রীজাতি বাঙালীর কাছে কাঁচাকলাজাতীয়। রৌদ্রবাতাসের সংস্পর্শে পরিণতি প্রাপ্ত হয়ে বিশ্বের ভিতর তার যথার্থ স্থান নেবার পূর্ব্বেই তাকে লঘুপথ্যরূপে হজমের চেষ্টা করা হয়ে থাকে, কারণ এবম্বিধ করাই hygienic। ব্যাধিগ্রস্ত বাঙালীর পক্ষে ও-বস্তুর পরিণত ও স্বাভাবিক অবস্থায় তাকে হজম করা দুঃসাধ্য বলে, অপরিপক্ক অবস্থায় রন্ধনের সাহায্যে উহাকে মুখরোচক করার চেষ্টা করতে হয়। এও একটা আর্ট বটে।

কিন্তু তাতে করে যা পাওয়া যায় তা মানুষ নয়—তা পুতুল, এবং সেই পরিবারকেই Ibsen "Doll's House" বলেছেন, যেখানে চালকের ইঙ্গিতে পুতুল নৃত্য করতে থাকে। তাঁর "The Wild Duck" ও "The Lady of the Sea"-তে ও এই বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন। শেষোক্ত পুস্তকে তিনি দেখিয়েছেন যে, স্বামীকে সাগরের মতো অসীম, উদার, গভীর ও বাধামুক্ত হতে হবে।

স্বাতন্ত্র্যের সহিত মিলনের সামঞ্জস্য কিরূপে সংঘটিত হতে পারে, এটা সম্ভবতঃ বুঝে ওঠা কঠিন; কিন্তু উভয়ের মিলন তো আর একের বিনাশ নয়;—স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করেই মিলন। সুরের মাধুর্য্য ছন্দের মিলকে অনাবশ্যক করে। প্রেমের গভীরতায় ব্যবহারিক বিরোধ লুপ্ত হয়ে যায়, এবং মুক্তির ক্ষেত্রেই প্রেমের লীলাভূমি। সম্ভবতঃ নিখিলেশের অসাধারণ ক্ষমাশীলতা কোনো কোনো পাঠকের নিকট পীড়াদায়ক হয়েছে। ক্ষমার রাজ্যে নারীজাতির একচ্ছত্র আধিপত্যে আমরা অভ্যস্ত। এ ক্ষেত্রে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁরা রাজ্ঞী হয়েছেন। পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা বা নিষ্ঠুরতা তাঁরা যখন নম্র হয়ে মার্জ্জনা করেন তখন তার ভিতর কোনো অসাধারণতাই আমরা দেখতে পাই নে, কেননা সেটা পুরুষের প্রাপ্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সুতরাং স্ত্রীসম্বন্ধে স্বামীর অভ্যস্ত ব্যবহারের ব্যতিক্রম আমাদিগকে এতই রুষ্ট করে তোলে যে, আমরা যষ্ঠী উত্তোলন করতে বাধ্য হই। বিমলা সম্বন্ধে নিখিলেশ সীতানির্ব্বাসনের পালা যে অভিনয় করেন নি—এ আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলে।

এরূপ রুষ্ট হওয়ার মূলে একটা গুরুতর কারণ রয়েছে, তা হচ্ছে অতীতনামক শব্দটির তাৎপর্য্য ঠিক বুঝতে না পারা। জগতে কিছুই

চিরকালের মতো হয়ে যায় না, অর্থাৎ কোনোকিছুরই সমাপ্তি নেই। কথাটি "Being" ও "Becoming" সম্বন্ধে মামুলী কুটতর্ক নয়—ইহা একটি সত্য; এবং এটি বর্ত্তমান যুগের একটি বিশেষ-সুর, যার প্রধান গায়ক Maurice Maeterlinck ও Rudolf Eucken।

Eucken বলেছেন—"If all depends on the slender thread of the fleeting moment of the present, which illumines and endures merely for a twinkling of an eye, but to sink into the abyss of nothingness, then all life would mean a mere exit into death.....Without connexion there is no content of life"। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভিতর দিয়ে অতীত যে নিয়ত আপনাকে গড়ে তুলচে, তা ভুললে অতীতের সমগ্র চেহারা দেখা হবেনা, সুতরাং খণ্ডভাবে দেখলে তাকে ভুল দেখা হবে! অতীত অপরিবর্ত্তনীয় শাশ্বত পদার্থ নয়,—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সংঘাতে সে রূপান্তর প্রাপ্ত হতে থাকে। Thomas Hardy তাঁর "Tess of the Durbervilles"-এ Tess-এর চরিত্রে এ সত্যটি চমৎকার ফুটিয়েছেন। নিখিলেশ সেই সমগ্রতার জন্য নীরবে অপেক্ষা করে ছিল। সে সত্য চেয়েছিল, মোহ চায়নি। সকল বিরোধের ভিতরেও নিখিলেশ প্রেমের শাশ্বতরূপ হারায়নি। তার মানসী, অপরিচ্ছন্ন দর্পনের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হওয়ার দরুণ, বিকৃত হয়েছিল মাত্র। তাই নিখিলেশ বল্‌ছে—

"এই বিশ্ববস্তুর পর্দ্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখ্‌লুম—কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয় অস্পষ্ট আয়না। যখন

বলি আয়নাটাই আমার করে নিই, বাক্সর ভিতর ভরে রাখি, তখন ছবি সরে যায়। থাক্‌না, আমার আয়নাতেই বা কি, আর ছবিতেই বা কি! প্রেয়সী, তোমার বিশ্বাস অটুট রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ, প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখ্‌চে।"

সাহিত্যে যে পদে পদে টীকার আবশ্যক হয়ে পড়ে, এটা মানবজাতির দুর্ভাগ্য। শুধু টীকার আবশ্যক হলেও এতটা গলদ্‌ঘর্ম্ম হতে হত না,—বিশদ টিপ্পনির আবশ্যকতা আরো বেশী। বাংলা নব্যসাহিত্যে টিপ্পনি মানে ভ্রান্তির সঙ্গে লড়াই;—comment নয়,—vindication। নব্যপন্থীরা শুধু ভাললাগার কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন। নজির না দেখিয়ে, কারো বিশেষ লেখা ভাল লাগচে, এ কথা প্রকাশ করা বিপদসঙ্কুল।

সর্ব্বদেশীয় সাহিত্যেই সমালোচনা আছে। ম্যাথু আর্নল্ড সমালোচনা দ্বারা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, কারণ তাঁর সমালোচনায় সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর "Poetry is a criticism of life" এখনো বহু সাহিত্যিকের চিন্তাকে প্রবুদ্ধ করছে। এঁদের সমালোচনায় সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। মনটাকে যতদূর সম্ভব সংস্কার বর্জ্জিত করে এঁরা সত্যলাভের চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য-প্রাসাদে এঁরা যেন আমাদিগকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, এবং অবরুদ্ধ দ্বারগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করে ভিতরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে চমৎকৃত করছেন। অপরপক্ষে বিদেশীয় সাহিত্যে বিরুদ্ধ সমালোচকও রয়েছেন। Ibsenকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। Cardinal Newmanকে

বিস্তর লাঞ্ছনা পেতে হয়েছিল। Dante বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু এঁদের দুর্ভাগ্য কাব্যকলাঘটিত নয়;—এঁদের বাণীর অপূর্ব্বতার জন্য; রসভাগের জন্য নয়;—বস্তুভাগের জন্য।

ইদানীং সমালোচনার মাপকাঠি আবিষ্কার করতে অনেকেই লেগে গেছেন। প্রথম আবিষ্কারের গৌরব যাঁর ভাগ্যেই পড়ুক, মাপকাঠিটি ব্যবহার করতে হলে যে ক্ষমতাটির একান্ত প্রয়োজন তা এখনি বলে রাখা যেতে পারে;—সেটি হচ্ছে সহানুভূতি। লেখকের সঙ্গে অনুভব করবার যাঁর ক্ষমতা নেই, তিনি সমালোচনার আসরে নামলে সাহিত্যের কোনো উন্নতি তো হতেই পারে না, বরং অশেষ অকল্যাণ হবার সম্ভাবনা। নব্যসাহিত্যের ভাবের দৈন্য ও ভাষার দৈন্যের প্রতি সম্প্রতিঅঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা হয়েছে। "ভাষার দৈন্য" বাক্যটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা এখনো সম্‌জে উঠতে পাচ্ছি নে। সবুজ পত্রীয় ভাষাকে "বীরবলী" বা "বিদ্‌ঘুটে" যা-ই বলা চলুক, দীন বললে শুধু "দীন" শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা অসাবধানতা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। ভাষার phonetics-এর সঙ্গে তার দীনতার কোনোই সম্বন্ধ নেই।

নব্য সাহিত্যের আর একটি দুর্নাম এই যে, তা সোজা কথাকে সোজা করে বলতে জানে না বা বলে না,—বাক্যের ব্যূহ ভেদ করে যে জিনিসটুকু পাওয়া যায়, তা এতই সামান্য যে মজুরী পোষায় না।

ঠিক একই ভাবকে পুনঃপুনঃ নানা কথায় প্রকাশ করলে, অর্থাৎ একই কথা একশো বার বললে তার জন্য একটা জবাবদিহি নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু প্রকাশের বিভিন্নতা দ্বারা Shades of meaning সূচিত হচ্ছে কিনা, তা খুঁজে দেখা উচিত। তা ছাড়া শব্দরাজ্যেও শিল্প

আছে, এবং সাহিত্যিকেরও শব্দশিল্পী হতে বাধা নেই। গদ্যসাহিত্যেও সঙ্গীতের আবশ্যক। নব্য সাহিত্যে ভাব-দৈন্য যে বিলক্ষণ রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কেননা এ সাহিত্যের ভাবে দেশের অভাব মোচন হচ্ছে না। কূপ খনন, প্রাইমারি বিদ্যালয় সংস্থাপন, ম্যালেরিয়া দমন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে, নব্য সাহিত্যিকগণ চিত্তের স্বাধীনতা ওরফে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দান করছেন, নয় তো ব্যর্থজীবনের সার্থকতা প্রমাণ করছেন, বা আলস্যের নিগূঢ় মহিমা কূটতর্কের সাহায্যে প্রতিপাদন করছেন—এক কথায় হেলাফেলায় জীবনটাকে কাটিয়ে দিচ্ছেন। এমন কি লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক—ওরূপ করার ভিতরে যে রমণীয়তা আছে—তা পর্য্যন্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন। এই ত হচ্ছে সমালোচকদের মত।

এককালে ইংলণ্ডেও কোনো কোনো লেখক "Art for art's sake" বাক্যটি সইতে পারেন নি! কিন্তু এখন সেদিন ঘুচে গেছে। Blackmore-এর "Lorna Doone" নিছক romance, কিন্তু রসসৌন্দর্য্যে epic-এর সৌভাগ্য লাভ করেছে। Hawthorne-এর "Scarlet Letter", Poe-এর "Tales of Mystery & Imagmation" শুধু রসিকের জন্য লিখিত। "Quo Vadis"-এ Cæsar-এর চরিত্র ওরূপ ভাবে বর্ণনা না করলে ইতিহাস কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হত না। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

সাহিত্যের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার সম্পর্ক সবুজ পত্র-সম্পাদক মহাশয় বিচার করেছেন, এবং তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে উক্ত ব্যাধি দমনের

চেষ্টা না করেও সাহিত্য চলতে পারে, এমন কি ওরূপেই সাহিত্যের চলা উচিত।

ফুলে ফলে বিচিত্র এই সৃষ্টিকাব্য ভগবানের অহেতুকী-আনন্দ হতে জন্মলাভ করেছে, এবং সেজন্য তাঁকে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, কেননা শাস্ত্রেই রয়েছে "আনন্দানি খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,"—অতএব তাঁর সাতখুন মাপ। কিন্তু মাটির কবি এ বিপুল সৃষ্টি-কাব্যের ভিতর আনন্দ আবিষ্কার করতে গেলেই তাঁর দুর্ভাগ্যের অন্ত থাকে না। লোক চক্ষুর অন্তরালে লক্ষফুল বিনা লক্ষ্যে ঝরে পড়চে; লক্ষগ্রহ বিনালক্ষ্যে নৃত্য করচে; লক্ষজীব বিনালক্ষ্যে দুদিনের জন্য পৃথিবীতে আসচে, যেন শুধু ফিরে যেতে; লক্ষহাসি হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে; লক্ষকান্না বৃথাই বক্ষবিদীর্ণ করচে। এ সকল বিচিত্র ব্যাপারের সংমিশ্রনে যে মহাকাব্য রচিত হচ্ছে, তা যে ভগবানের শুধু লীলাখেলা—তা মানতে তো কারো আপত্তি দেখছি নে!

জীবনের সকল ক্ষেত্রেই—সুতরাং সাহিত্যেও—সত্যকে জানতে হলে প্রথমতম এবং প্রধানতম আবশ্যকীয় জিনিস হচ্ছে চিত্তের স্বাধীনতা। মানুষের বিশেষত্ব হচ্ছে বিচার-ক্ষমতা, অন্ততঃ বিচার-প্রবৃত্তি। যেখানে সে প্রবৃত্তি নেই, সেখানে তর্ক করে বোঝাবার চেষ্টা শুধু অরণ্যে রোদন।

শ্রীশিশিরকুমার সেন।

পুষা

আচার ও বিচার।

আচার ও বিচারের মধ্যে বিবাদটা সম্প্রতি যেন একটু বেশী মাত্রায় পাকিয়া উঠিয়াছে। উভয়ের এই গরমিলটা যে নিতান্ত একেলে—সেকালে যে ইহার নামগন্ধ ছিল না, এমন একটা আক্ষেপের কারণ নিশ্চিতই নাই। মানুষ যে দিন হইতে এই ধরাধামে সমাজ বাঁধিয়া বাস করিতে শিখিয়াছে, সেই দিনেই এই বিবাদের সূত্রপাত। তবে অবশ্যই ইহা ভাদ্রের ভরা নদীর মত চিরক্ষণই খর একটানা বয় না, ইহাতে হ্রাস বৃদ্ধি, উজান ভাটি সবই আছে।

আচার যে প্রথম দেখা দেয়, সে তো বিচারেরই হুকুমে। দুয়ের মধ্যে সদ্ভাব থাকাই ত সামাজিক সুস্থতার অবস্থা। সমাজের দেহে যখন ব্যাধির প্রকোপ ঘটে, তখনই না এই বিরোধের সূচনা! সমাজ যে কখনই সুস্থ থাকে না এমন নয়, তাই বিচার ও আচারের মিলও অনেক সময় অনেক স্থলে টিঁকিয়া থাকে। কিন্তু যখন বিবাদ বাধে, তখন আর সহজে মিটে না। গালাগালি থেকে হাতাহাতি, এমন কি রক্তারক্তিতেও দাঁড়াইতে পারে।

তবে সুখের বিষয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ এখন অনেকটা মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারে। অবশ্য বৈষয়িক স্বার্থের ব্যাপারে ইহার ঠিক উল্টা। যে দিন ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ উভয় ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে, সে দিন জগতে মহা মঙ্গলের যুগ দেখা দিবে। বর্ত্তমানে বিচার ও

আচারপক্ষের বিরোধে তত্টা হলাহল না থাকুক, ইহা যে শুক ও শারীর দাম্পত্য কলহের মত সহজে মিটিবার নয়, এটা ঠিক। এখন সভ্য সমাজে বিচার ও আচার পূর্ব্বের ন্যায় আর রক্তচক্ষে পরস্পরে তাল ঠুকিয়া দাঁড়ায় না বটে, তাহা বলিয়া রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি এখনও বড় কম নাই। এখন এক পক্ষ অপর পক্ষকে আগুনে পোড়ায় না, বা জলে ডুবায় না বলিয়াই যে একেবারে প্রেমে বিগলিত হইয়া কেবলই সুধাবচনে বুঝাইতে থাকে, সমগ্র মানবসমাজ আজও এতটা সমুন্নত নয়। যাই হক, এখন এই বিরোধের বিষয়ে কিছু বলিবার আগে ইহার প্রকৃতিটা একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাক।

একটা প্রথা যখন দেখা দেয়, তাহার মূলে একটা বিচার ও যুক্তি অবশ্যই থাকে। ভাষান্তরে প্রথাটাকে বিচারের একটা সম্পত্তিবিশেষ বলা যাইতে পারে। নিজের জিনিস হইলেও বিচার, প্রথার রক্ষার ভার চিরদিন নিজের হাতে রাখে না। কালে সেটা আচারেরই কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। প্রথাটাকে যখন কাজের পর কাজে লাগান হয়, বিচার আর তাহাকে লইয়া প্রতিপদে নাড়া-চাড়া করে না। সেটাকে আচারের হাতে ছাড়িয়া দিয়া সে কতক নিশ্চিন্ত থাকে। অনেক সময় বহুদিন ধরিয়া বিচার তাহার খোঁজ-খবরও বড় রাখে না। আচার কিছুদিন সেটাকে চালায়ও বেশ। কিন্তু সে ক্রমে সেটাকে নিজেরই একটা শক্তির বিকাশ বলিয়া মনে করে, সেটার সঙ্গে বিচারের যে কিছু সম্পর্ক আছে, তাহা সে যেন এক রকম ভুলিয়াই যায়। এইরূপে প্রথাটা ক্রমে আচারের হাতে একটা উৎপীড়ন ও উপদ্রবের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বিচার হইতে বিচ্যুত হইলে, আচার একটা অন্ধ শক্তি মাত্র। অনেক সময় এই মোহান্ধ আচার নিজের প্রভাব ও জেদ বজায়

রাখিতেই বেশী সমুৎসুক, সমাজের হিতের দিকে সে ফিরিয়াও তাকায় না। তাই যে প্রথাটা প্রথমে মঙ্গলের মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিল আচারের জোর ও জবরদস্তিতে সেটা ক্রমে মহা অনর্থের হেতু হইয়া উঠে।

একটা বিশেষ উদাহরণ লইয়াই ব্যাপার দেখা যাক্। বাঙ্গালায় কৌলীন্য-প্রথা অবশ্যই প্রথমে সৎ বিচারবুদ্ধি হইতেই দেখা দিয়াছিল। গুণের আদর করা সমাজের পক্ষে অবশ্যই হিতকর। কৌলীন্য-প্রথা মূলতঃ এই গুণের আদর ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু প্রথাটী যখন অন্ধ আচারের কবলে পড়িয়া গেল, তখন কোথায় তাহার সেই প্রাথমিক মঙ্গল মূর্ত্তি! সূর্য্য-বংশের একজন গুণসম্পন্ন রাজা যখন মুনি-পুত্রের শাপে রাক্ষস হইয়া পড়িলেন, তখন তাহার উপদ্রবে দেশময় ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছিল। কৌলীন্য-প্রথায় কাহার অভিশাপ লাগিল জানি না, কিন্তু তাহার উপদ্রবে বড় কম রাক্ষসী শক্তির লীলা দেখা যায় নাই। ঐ যে নৈকষ্য কুলীনপ্রবরের চিতাগ্নির সঙ্গে কাহন দুই চার বাঙ্গালী রমণী—তাহাদের বয়সের ভিন্নতা শুধু পাঁচ হইতে পঞ্চাশের মধ্যেই নয়, মানুষের আয়ুষ্কাল ঐ উভয় সংখ্যার অপর পার্শ্বেও যতটা যাইতে পারে, তাহাও বাদ পড়ে না—অম্লান বদনে শাঁখা ভাঙ্গিতেছে ও সিঁদুর মুছিতেছে, কৌলীন্য-প্রথার এই বিকট লীলাটা রাক্ষস দেহধারী সৌদাসের উপদ্রবকেও কি হার মানায় নাই? আশার কথা, অভিশপ্ত সৌদাস যেমন শেষে শাপমুক্ত হইয়াছিল, এই বাঙ্গালা দেশটাও ক্রমে এই নাগপাশটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। বিচার আবার আচারের কবল হইতে এই প্রথাটীকে কাড়িয়া লইতেছে।

তবে পৃথিবীর সকল আচারেই কি শেষে এতটা কালো রংয়ের পোঁচ পড়ে? নিশ্চয়ই নয়। কৌলীন্য-প্রথা এতটা বিকট মূর্ত্তি

ধরিয়াছে বলিয়া যে প্রথামাত্রেই শেষে উহার মত হইয়া দাঁড়ায়, অবশ্যই এ কথা বলা চলে না। কিন্তু বিচার ও যুক্তির সংস্পর্শ ছাড়িয়া বহুদিন একা থাকিলে, প্রথা যে ক্রমে বিগড়াইতে থাকে, এটা সত্য কথা।

(২)

কৌলীন্য-প্রথার মত সকল প্রথার এতটা অপব্যবহার না ঘটুক, কিন্তু অনেক প্রথারই শেষে সুযোগ্য ব্যবহার থাকে না। বিচার তাই আচারের হাত থেকে সেগুলো লইয়া একটু মাজা ঘষা করিতে চায়। দেশের যে অবস্থার মধ্যে একটা প্রথা দেখা দেয়, সে অবস্থা কি চিরদিন একই থাকে? চুরি ও ডাকাতির সময় শ্যামচাঁদের অর্থ রূপচাঁদের পেটরায় থাকুক, ভালই। কিন্তু তাহা বলিয়া যখন উপদ্রব চলিয়া যায়, তখন শ্যামচাঁদ তাহা নিজের হাতে লইয়া কেন নিজের কোন কাজে না লাগাইবে? রূপচাঁদের তাহা এমন করিয়া আটকাইয়া রাখা কেন?

আচ্ছা, এবার ধরা যাক বাঙ্গালার অবরোধ-প্রথা। ইহা নিশ্চিতই হিন্দুত্বের একটা বিশেষ বা সনাতন অঙ্গ নয়। যদি তাহা হইত, তবে সমগ্র হিন্দুর মধ্যেই ইহার প্রভাব দেখা যাইত। হিন্দুমান্দ্রাজ বা হিন্দুবোম্বায়ে এই প্রথার নিদর্শন খুব কমই মিলে। বাঙ্গালাতেই ইহার বিশেষ আঁটাআঁটি। মুসলমান-যুগের পূর্ব্বে এখানেও ইহার আধিপত্য এতটা ছিল না। ঠিক কোন সময়ে বা কোন কারণে ইহা প্রথমে দেখা দিয়াছিল, তাহার আলোচনা এখন নাই করিলাম। কিন্তু এই প্রথাটা যে বিশেষ প্রয়োজন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা যে অকারণে বাঙ্গালী রমণীকে ঘরের কোণে আটক করিয়া রাখে নাই, এটা বোধ

হয় সকলেই মানিবেন। একটা প্রবল অত্যাচারের হাত থেকে দুর্ব্বলের রক্ষার জন্যই ইহার সৃষ্টি, অনেকে এইরূপ বুঝেন। ফল কথা একটা সাময়িক অবস্থার বিচার হইতেই এই আচারের আবির্ভাব। কিন্তু এখন আবার সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায়, বিচার এই আচারটাকে একটু বদলাতেই চায়। আচার বিচারের এই কাজে বাধা দিতে ছাড়ে নাই, কিন্তু দুই এক পা করিয়া হঠিয়াছে। যাঁহারা এই প্রথাটাকে একটু বেশী মাত্রায় লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর রাগিয়াই উঠি, আর ঠাট্টাই করি কেহই আর এই প্রথাটিকে পূর্ব্বের মত কড়া করিয়া রাখিতে পারিতেছি না।

বিচারের তাড়নায় আচারের বাঁধন ক্রমে শ্লথ হইতেছে। অসূর্য্যম্পশ্যরূপারা ক্রমে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রস্নাত রেলওয়ে-মঞ্চে গিয়া দেখা দিতেছেন। লোকের ভিড়ের মধ্যে দেড় হাত ঘোমটা দিয়া কি আর দোড়ধাপ করা চলে, কাজেই সেটারও বহর ক্রমে কমিয়া আসিল। অসূর্য্যম্পশ্যরূপার যুগটাকে এখন আর বাঁধিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। যেরূপ ব্যাপার, কালে এ শব্দটা দেখিতেছি শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসেই থাকিয়া যাইবে, বাঙ্গালীর গৃহবাসে উহা বড় আর লক্ষিত হইবে না।

তবেই দেখা যাইতেছে প্রধানতঃ দুই প্রকার স্থলে বিচার আচারকে লইয়া একটু বোঝা পড়া করিতে চায়। এক, যখন প্রথা-বিশেষের অপব্যবহার ঘটে, দ্বিতীয়, যখন দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে সেটা খাপ্ খায় না। এই দুই রকমের দুইটি মাত্র প্রথার এখানে উল্লেখ করা গিয়াছে। সমগ্র মানব-সমাজ ও তাহার ইতিবৃত্ত খুঁজিলে বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে। তবে এইরূপ প্রথাগুলি ঐ

দুইটা ভাগের ঠিক একটা ভাগে পড়িবেই, ইহা বলা চলে না। কারণ এই রকম একটা প্রথার দুই রকম বিশেষত্বই থাকিতে পারে, অশুভ ব্যবহার ও অযথা ব্যবহার একেরই এই দুইটী দিক থাকিতে পারে। সাধারণত এই প্রকারের সকল প্রথাতেই কিছু না কিছু এই দুইটী লক্ষণই দেখা যায়। তবে অনেক স্থলে একটী লক্ষণকে আর একটীর চেয়ে বড়ই প্রবল মনে হয়। এই লক্ষণের প্রাবল্য অনুসারেই এই প্রকার একটী মোটামুটি ভাগ করা চলে। ফল কথা, প্রথাবিশেষের অযোগ্য বা বেখাপ্পা ব্যবহারের মধ্যে কিছু না কিছু অশুভ ঘটে, আবার অশুভ ব্যবহারটা তো অযোগ্য বা বেখাপ্পা বটেই।

(৩)

যাক, এ সম্বন্ধে বিভাগটা সূক্ষ্ম না হউক, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত প্রথাগুলা লইয়াই যে বিচার ও আচারে লড়াই বাধে এবং সে লড়াই যে সহজে মিটে না, এটা ঠিক। সমগ্র মানব-সমাজ ধরিলে পৃথিবীর বক্ষে এই লড়াই যে বারমাসই চলিতেছে, এরূপ বলাটা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়। কারণ আচারের অন্ত নাই, বিচারের বিরাম নাই। একটী বিশেষ দেশের একটা বিশেষ আচার লইয়া অবশ্যই অনেক সময় কোন রকম গোলযোগ নাও থাকিতে পারে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি আচার ও বিচারের সম্পর্কটা একেবারে অহি-নকুলের সম্পর্কের মত নয়। প্রথমে দুয়ের মধ্যে একটী বিশেষ মাখামাখি থাকিবারই কথা—আর এইটীই হইল সামাজিক সুস্থতা বা আরামের অবস্থা। কিন্তু ছোট খাটো দেশসম্বন্ধে যাহাই হউক, সমগ্র পৃথিবী-ময় এই আরামটা কখন লক্ষিত হয় বলিয়া মনে হয় না।

যে ব্যাপারেই হউক আরামের অবস্থাটা যে বেশ সুখকর, এ সম্বন্ধে বড় দ্বিমত নাই। কিন্তু বিসম্বাদকে বর্জ্জন করিয়া কেবল আরামে কাল কাটানো বুঝি প্রকৃতির অভিপ্রায় নয়। বিশ্বপ্রকৃতিরও নয় মানবপ্রকৃতিরও নয়। অন্ততঃ দুয়ের ভাগ্যে একটানা আরামের ভোগ বিধাতা যেন লিখেন নাই। তাই বিশ্বের মাঝে একটা না একটা সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে, মানব-সমাজেও এই সংঘর্ষের কখন অনাটন হয় না। বিশ্বের তুলনায় মানব-সমাজ অবশ্যই অতি ক্ষুদ্র। এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অনেক সময়েই আমরা একটা আরামের আশা করিতে পারি। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না কেন? এখানে হিসাবে যে একটু ভুল হইতেছে। বিশ্বের কাছে মানব-সমাজ নিশ্চয় খুবই ছোট সমুদ্রের কাছে জলবিন্দু, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এ কথাটা যে শুধু বাহিরের আয়তনেই খাটে। মানবের যে বাহির ছাড়া একটা অন্তর-আয়তন আছে। বিশ্বের সেটা আছে কিনা জানি না, অন্ততঃ তাহার খোঁজ আমরা বড় পাই নাই। মানবের বাহিরের চেয়ে এই অন্তরের আয়তনটা এত বেশী যে আমরা তাহার মাপজোখ কোন দিন করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। আচার ও বিচারের সংঘর্ষটা মানবের এই অন্তর-রাজ্যের অন্তর্গত। তাই এই বিপুল মানসক্ষেত্রে ইহার বিরতির আশাটাও যেন সুদূরপরাহত।

এখন দ্রষ্টব্য বিচার বলিয়া এই জিনিসটা দেখা দেয় কোথায়? অবশ্যই এটা একটা দৈব বিড়ম্বনা নয়। বিচার ও আচারের ভাঙ্গা-গড়ায় দেবতারা কোন হাত লাগান না। আচার মানুষেই গড়ে, ভাঙ্গেও তাহা মানুষে। অনেক সময় পাঁচজনে পরামর্শ করিয়া গড়ে, আবার অনেক সময় একজনের মাথাতেই আসে, শেষে পাঁচজন

আসিয়া তাহার সহিত যোগ দেয়। গড়ার বেলা যেমন, ভাঙ্গার বেলায়ও তেমন। হয় একজন, নয় পাঁচজনে মিলিয়াই বিচারের হাতুড়ী তোলে। যাহারা হাতুড়ী তোলে, তাহারা বাস্তবিক হাতুড়ে লোক নয়। বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, মহম্মদ ইহাঁদেরও হাতুড়ী ধরিতে হইয়াছে। নিজেদের হাপরে দেশের অনেক আচারকে ইহাঁরা ভাঙ্গিয়া পিটিয়া অন্য রকম করিয়া গড়িয়াছেন। ইহাঁদের অপেক্ষা কম নামজাদা লোকেরাও এ কাজে হাত দিয়াছেন। ক্ষমতার তুলনায় তাঁহারও তাঁহাদের সময়ের বড় কম গণ্য ব্যক্তি নহেন। নানক, কবীর, লুথার, নক্স—ইহাদেরও নাম পৃথিবীর ইতিহাসে গৌরবের স্থান পাইয়াছে। ধরণীর বক্ষে বর্ত্তমানেও এইরূপ লোকের অসদ্ভাব নাই। ইহাঁদেরও ললাটে প্রতিভার জ্যোতি দেদীপ্যমান। চারি পাশের আবরণ সেটাকে যতই ঠেলিয়া রাখিতে চেষ্টা করুক, তাহার প্রসার ক্রমেই বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না।

(৪)

আচার জিনিসটা কি নিতান্তই ভূতের বোঝা, ওটাকে যে কোন রকমে সমাজের ঘাড় হইতে নামনই কি উন্নতির একমাত্র নিদর্শন? উহা কি কেবলই জগদ্দল-পাথরের মত মানুষকে নীচের দিকে টানিয়া রাখে, উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই কি মানুষ অমনি হাউয়ের মত উপরের দিকে ছুটিয়া যায়? এমন একটা অসম্ভব ধারণা কাহারও আছে কি না জানি না, আচারকে এতটা অমঙ্গল মনে করিবার কোন কারণই নাই। আচার আষাঢ়ে গল্পের ভুঁইফোড় রাক্ষসের মত আকাশ

পাতাল হাঁ করিয়া সহসা নিজের বিকট মূর্ত্তি বাহির করে না, উহা বাস্তবিকই বিচারের পবিত্র যজ্ঞকুণ্ড হইতেই উদ্ভূত হয়। এমন পবিত্র আকারে যাহার জন্ম তাহাতে মানুষের কোন হিত সাধিত হয় না, এ কথা বলিলে মানিবে কে?

বাস্তবিক যজ্ঞকুণ্ড হইতে উদ্ভূত মহাবীরের মতই আচারের কর্ম্মশক্তি অপরাজেয়। লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে বিচার যতদিন এই সত্যকে নিয়মিত রাখে, ততদিন তাহা দ্বারা মানুষের কি পরিমাণ মঙ্গল সাধিত হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আচারকে বাদ দিয়া যদি শুধু বিচারের দ্বারাই সমাজের কাজগুলা চালান হইত, তবে কার্য্যের ক্ষেত্র কখন তেমন ব্যাপক হইত না, কাজও তেমন জোরে চলিত না। সেক্সপীয়রের হ্যামলেটের মত বিচার প্রতি পদে এতটা যুক্তি ও তর্কের ওলট-পালট করিত যে তাহার কাজের অবসর কমই মিলিত। তাহা ছাড়া বুদ্ধি-বৃত্তির উপর সকল মানুষের তো সমান দখল নাই। তাই মনে হয় শুধু বিচারের হাতে কাজের ভার থাকিলে, কাজটা বড়ই ঢিমে চলে, এমন কি অনেক স্থলে একেবারে হয়তো চলেই না।

পৃথিবীর কোন জায়গায়ই আজও এমনটা ঘটে নাই। আচার ও বিচার চিরদিন সর্ব্বত্র পাশাপাশি আছে। কখন দুইয়ে মিলিয়া একসঙ্গে মানবের উন্নতির পথ সাফ করে, আবার কখন বা দুজনে হাতাহাতি ধাক্কাধাক্কি করিতে করিতেই মানবসমাজকে ঠেলিয়া ক্রমে উচ্চের দিকে লইয়া যায় যদি বা কখন এই ঠেলাঠেলির মধ্যে সমাজটা একটু হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়ে, সে অধঃপতন, সাময়িক। তাহাকে আবার উঠিতেই হয় এবং যতদিন না একটু সাম্যের অবস্থা আসে, ততদিন ধাক্কা খাইতে খাইতেই চলিতে হয়। এইরূপ বিপরীত ধাক্কার মধ্যে উন্নতির

গতি কখনই দ্রুত হইতে পারে না, কিন্তু তাহা বলিয়া নিয়তি যে মানব-সমাজের ললাটে কখনো একটা দুরপনেয় চিরস্থবিরত্বের রেখা টানিয়া বসে, এ বিশ্বাস করা চলে না।

তবেই বুঝিতেছি, মানব-সমাজে বিচার ও আচার দুয়েরই প্রয়োজন। একটা অথবা অন্যটাকে ধরিলেই আমাদের চলে না। যাঁহারা আচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহারা আচারের পাট একেবারে লোপাট করিয়া কেবলমাত্র বিচারকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। সমাজের পরিচালনায় বিচার রাজা, আচার তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ। যেখানে আচার বিচারকে সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছে কিংবা ঐরূপ হইতে চেষ্টা পাইয়াছে বিচারপক্ষীয়েরা সে স্থলে বিচারকে আবার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন মাত্র, কার্য্যা-ধ্যক্ষের পদটাকে একেবারে উঠাইয়া দেন নাই। তাঁহারা কখনও বা বিদ্রোহী কার্য্যাধ্যক্ষের স্থানে অনুরক্ত কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়া, আবার কখন বা পূর্ব্বের কার্য্যাধ্যক্ষটিকে শাসনে ও সদুপদেশে প্রকৃতিস্থ করিয়া সমাজের পরিচালনায় সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আচারের কার্য্য-শক্তির বিলোপ করা কাহারও অভিপ্রেত নয়, সেই শক্তিকে বিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাখাই বিচারপক্ষীয়ের উদ্দেশ্য। যখন কোন আচার সর্ব্বগ্রাসী হইয়া দাঁড়ায়, তখন এ উদ্দেশ্য সাধন করা বড় সহজ নয়। একটা বিষম সংঘর্ষের সম্ভাবনা তখন আছেই।

বর্ত্তমানে ঐ সম্ভাবনাটা সত্যে দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবী ব্যাপিয়া বলিলেই হয়, এখন এই বিচার ও আচারের একটা মহা সংঘর্ষ চলিতেছে। আমাদের দেশটা পৃথিবী ছাড়া নহে, এখানে ও যে সেই সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে, ইহা স্বাভাবিক। পরিণামে ন্যায়েরই জয়, এ আশা

মানুষ চিরকালই করে, দেবতাও সে আশা ভঙ্গ করেন না। সংঘর্ষ যদি অনিবার্য্যই হয়, তবে তাহা চলুক, কিন্তু ইহাতে বিদ্বেষটা যেন বেশী জাগিয়া না উঠে, উভয়পক্ষ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিলে সমাজের মঙ্গল বৈ অমঙ্গল নাই।

শ্রীদয়াল চন্দ্র ঘোষ।

শরৎ।

—*—

মেঘেরা গিয়েছে ভেসে দূর দ্বীপান্তর
অবাধে পড়িছে ঝরে আলোক রবির।
আকাশ জুড়িয়া ওড়ে সোণার আবির
ধরেছে সোণালি রঙ সবুজ প্রান্তর॥

ক্ষীণপ্রাণ সুকুমার সলজ্জ মন্থর
বাতাস বহিয়া আনে স্পর্শ করবীর।
সোণার স্বপন আজ প্রকৃতি কবির
এসেছে বাহিরে তার ত্যজিয়া অন্তর॥

শরতের এ দিনের সুবর্ণের মায়া।
না ঘুচায় অন্তরের চিরস্থির ছায়া॥

আলোর সোণার পাতে মোড়া নভদেশ
ফুটিয়ে দেখায় তার অনন্ত নীলিমা।
এ বিশ্বের রহস্যের নিবিড় কালিমা;
রঞ্জিয়াছে প্রকৃতির ওই ঘন কেশ॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কংগ্রেসের দলাদলি।

সম্প্রতি বাংলায় কংগ্রেসের দল যে দু'টুকরো হয়ে পড়েছে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আমাদের দেশে যাত্রার দল বেশী দিন গোটা থাকে না, একদিন-না-একদিন তার ভিতর থেকে একটা-না-একটা ভাঙ্গা দল বেরিয়ে পড়েই পড়ে।

আমি যখন ছোট ছেলে, তখন বাংলাদেশে একটি জবর যাত্রার দল ছিল, তার নাম বৌ-মাষ্টারের দল। সেই দল ভেঙ্গে যখন দু'দল হল, তখন উভয় দলই নিজেদের বৌ-মাষ্টারের দল বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন। দেশের লোক,—কোন পক্ষের দাবী ঠিক, তা ঠিক করতে না পেরে,—এই নামের মামলার একটা দু-পক্ষের-মনরাখা-গোছের মীমাংসা করে দিলে। যে দলে জুড়ি বেশী আর ছোকরা কম, তার নাম দিলে বৌ-মাষ্টারের দল,—আর যে দলে ছোকরা বেশী আর জুড়ি কম, সে দলের নাম রাখলে বৌ-মাষ্টারের ভাঙ্গা দল

আজকের দিনে, কলিকাতা সহরে, যখন কংগ্রেসের উভয় দলই নিজেদের অভ্যর্থনা-সমিতি বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছেন, তখন আমার মতে এ দুয়ের ভিতর যে দলে জুড়ি বেশী ছোকরা কম, সে

দলকে পুরোণো বৌ-মাষ্টারের দল—আর যে দলে ছোকরা বেশী জুড়ি কম, সে দলকে নতুন বৌ-মাষ্টারের দল বলাই সঙ্গত। এ দুটি নাম এই দুই দলের গায়ে যে কেমন খাপে খাপে বসে যায়, তা যাঁর চোখ আছে তাঁকে আর দেখিয়ে দিতে হবে না।

এ দলাদলির কারণটা যে কি, তা আমাদের বুঝে দেখা আবশ্যক।

এবার কংগ্রেসের যাত্রা শুনতে ভারত-সাম্রাজ্যের বড়কর্ত্তা স্বয়ং মন্‌টেগু সাহেব, সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে এদেশে আস্‌ছেন; এবং গুজব এই যে, তাঁকে খুসি করতে পারলে, তিনি আমাদের একটা মস্ত বড় পেলা দেবেন—স্বরাজ্য। সুতরাং এবারে কে মূল গায়েন হবেন—তাই নিয়ে যত মারামারি। মন্‌টেগু সাহেবের মনের খবর আমরা বড় একটা রাখিনে; কার গলা শুনে তিনি খুসি হবেন আর কার গলা শুনে তিনি চটে যাবেন,—পুরুষের মেয়েলি গলা আর স্ত্রীলোকের মর্দ্দানা আওয়াজ, এ দুয়ের ভিতর কোনটি তাঁর বেশী পছন্দসই—সে কথা বলা আমাদের পক্ষে অসাধ্য, কেননা আমরা হচ্ছি সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নই। যেহেতু আমাদের কাজ হচ্ছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো, আর এঁদের পরের খেয়ে দেশের গরু চরানো,—সে কারণ আমরা অবশ্য এঁদের চাইতে ঢের বেশী নির্ব্বোধ জীব। তবে সাহিত্যের দিক থেকে এ কথা আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট যে বক্তৃতা পাঠ করবেন, তা পাঠ করে আমরা খুসি হব; কেননা তাতে এমন একটি জিনিস থাকবে, যা কংগ্রেসের ধাতে

নেই;—সে হচ্ছে Style। কংগ্রেসী-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, সে সাহিত্য গড়া যেমন সহজ, পড়া তেমনি কঠিন। মামুলি কংগ্রেসী সাহিত্যের দুধে পৌঁছনো যে কতটা অসম্ভব, তার পরিচয় পাওয়া যায় কংগ্রেসের গত অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে, এবং ইংরাজি ভাষাতেও যে খাঁটি বাঙ্গলা বক্তৃতা করা যায়, তার পরিচয়ও পাওয়া যায় কংগ্রেসের গত অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে।

আবার এ কথাও শুনতে পাই যে, ঝগড়াটা আসলে গায়ক নিয়ে নয়,—পালা নিয়ে। এক দলের মতে নাকি পালাটা হওয়া উচিত "ভারতভিক্ষা", আর এক দলের মতে "ভারতসঙ্গীত"।

পুরোণো দল নূতন দলকে বলছেন যে, অর্ব্বাচীন তোমরা যদি গান ধরো—

"বাজরে শিঙ্গা, বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে"—

তাহলে তোমরা সত্য সত্যই শিঙ্গে ফুঁকবে।

অপরপক্ষে নতুন দল পুরোণো দলকে বলছেন যে, প্রাচীন তোমরা যদি গান ধরো—

"কি শুনিরে আজ, পুরি আর্য্যদেশ
এ আনন্দ-ধ্বনি কেনরে হয়"—

তাহলে সে আনন্দধ্বনি বস্তুতঃ আক্রন্দধ্বনিই হবে।

কথায় যে শুধু কথা বাড়ে তাই নয়, সেই সঙ্গে তার সুরও চড়ে যায়। তাই দু-পক্ষই আজ চড়া সুরে কড়া কথা বলতে সুরু করেছেন,—অবশ্য পরস্পরকে। সে সব কথার অলঙ্কার বাদ দিলে দাঁড়ায় এই যে—নবীন দলের মতে, কংগ্রেস এবার প্রাচীন দলের হাতে পড়লে তাঁদের কীর্ত্তনের চোটে দশের দশা ধরবে, আর দেশের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকবে না; আর প্রবীণ দলের মতে, কংগ্রেস এবার নবীন দলের হাতে পড়লে তাঁদের নর্ত্তনের চোটে দেশের এ নব রাজসূয়যজ্ঞ নব দক্ষযজ্ঞে পরিণত হবে।

এ দুই পক্ষের কোন পক্ষ ঠিক বলা কঠিন। কেননা উভয় পক্ষেরই নিজের নিজের হয়ে দু চার কথা বলবার আছে। পুরোণো দল বলেন—দেখো, আমরা আজ ত্রিশ বৎসর ধরে চাইতে চাইতে চাওয়া বিষয়ে পাকা হয়ে উঠেছি; সুতরাং মন্টেগু সাহেবের কাছে কি চাইতে হবে, তা আমরা যেমন জানি এমন আর কেউ জানে না।

নূতন দল এর উত্তরে বলেন,—হ্যাদেখো, তোমরা গত ত্রিশ বৎসর ধরে চেয়ে আসছ বটে, কিন্তু মেকি ছাড়া আর কিছু পেয়ে এসো নি। এখন যখন বিলেত আমাদের বহুকালের দেনা পরিশোধ করতে উদ্যত হয়েছে—তখন আমাদের ন্যায্য পাওনা আমরা ষোল আনা বুঝে নেব, আর তার প্রতি পয়সাটি বাজিয়ে নেব।

এখন ন্যায্য পাওনাটা কি, তাই নিয়েই ত যত গোল। এ বিষয়ে কোনও পক্ষের যে একটা পরিষ্কার ধারণা আছে, তার পরিচয় ত তাঁদের কথাবার্ত্তায় বড় একটা পাওয়া যায় না। গোলের মূল ত ঐখানেই। আমাদের ভাবী "স্বরাজের" একটা স্পষ্ট রূপ কারও চোখে নেই—অথচ তার নাম সকলের মুখেই রয়েছে। অতএব আসল বস্তুর চাইতে তার নামের মাহাত্ম্য ঢের বেড়ে গেছে! তাই "হোম-রুল" এবং সেল্‌ফ্‌-গভর্ণমেণ্ট উভয়ে যুদ্ধং দেহি বলে কংগ্রেসের আসরে নেবেছেন। অথচ এই দুটি বাক্যের যে একই অর্থ, তার দলিল কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগের দস্তখতি দরখাস্ত। অতএব দেখা গেল ঝগড়াটা পালা নিয়েও নয়, কেননা উভয় পক্ষের মতেই এবার কংগ্রেসে অযোধ্যা কাণ্ডের অভিনয় হবে—অর্থাৎ লক্ষ্ণৌএর পালার পুনরভিনয় হবে। সুতরাং দাঁড়াল এই যে—"বর বড় কি কণে বড়" এই নিয়েই আড়াআড়ি।

রাজনীতিতে রাজনীতিতে যখন বিবাদ ঘটে, তখন তার মীমাংসা করে দিতে পারে একমাত্র সরল নীতি; আর যেখানে দু-পক্ষই বেঁকে বসে, সেখানে তাদের সিধে করে বসাতে পারে একমাত্র সেই লোক—যিনি কোনও পক্ষেরই তাঁবে নন, এবং দু-পক্ষেরই উপরে। সুতরাং এ অবস্থায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মধ্যস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই আসরে নামাতে, দেশে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হয়েছে। রাজনীতি যাঁদের ব্যবসা নয়, সেই সব দেশভক্ত লোকের হর্ষের কারণ,—তাঁরা জানেন মনের উদারতায় আর হৃদয়ের গভীরতায় তাঁর সমকক্ষ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, এবং তাঁর বাণী পৃথিবীসুদ্ধ লোক কাণ খাড়া করে শুনবে, কেননা ভাষার সৌন্দর্য্যে আর ভাবের ঐশ্বর্য্যে সে বাণীর তুলনা ভূ-ভারতে মেলা দুর্লভ। অপর পক্ষে রাজনীতি যাঁদের পেশা, তাঁরা ভয় পান যে কংগ্রেসের আসরে দণ্ডায়মান হলে তিনি শুধু প্রেমের গান গাইবেন,—কেননা তিনি কবি। তিনি যে হিংসার গান গাইবেন না, এ কথা সত্য। দেশের কথা আর দ্বেষের কথা যে এক কথা নয়, এ বানান-জ্ঞান তাঁর আছে।—ভয়ের আরও কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, তার উপর তিনি বাউল,—সুতরাং তিনি কংগ্রেসের সাধা রাগ ও বাঁধা তাল কিছুই মানবেন না, এমন কি সে বৈঠকের কায়দাকানুনও নয়। যেখানে হাঁটুগেড়ে বসে সুরভাঁজা দস্তুর, সেখানে হয়ত তিনি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে খোলা গলায় এমনি সুর ধরে দেবেন, যে সুরের আগুন

ছড়িয়ে যাবে সবখানে। কাজেই রাজনীতির পেশাদার ওস্তাদেরা হয় গালে হাত দিয়ে বসে ঢোক গিলছেন, নয় বিড়বিড় করে প্রলাপ বকছেন।

আমি বলি তোমাদের কোনও ভয় নেই। যে চোরা গলিতে তোমরা ঢুকেছ, সেখান থেকে কেউ যদি তোমাদের উদ্ধার কর্‌তে পারে—তাহলে এক রবীন্দ্রনাথই পারবেন, অপর কেউ পারবে না। কেননা তিনি মুক্ত আকাশের দেশের লোক,—তাঁর অনুগামী যে হবে, তাকে দিনের আলোয় সত্যের সরল ও উদার রাজপথে আস্‌তেই হবে।

এদিকে তোমরা ত ভ্রাতৃবিরোধে মেতে আছ,—আর ওদিকে? ওদিকে এ দেশের বে-সরকারী ইংরেজের দলও মন্‌টেগু সাহেবকে বেশ ভাল করে গান শোনাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তাঁরা Bray-Chorus নামক একটি বিলাতি যাত্রার দল এক রাতে গড়ে তুলেছেন। এঁদের পালার নাম স্বরাজ-দমন, এবং তার ধুয়ো হচ্ছে—"হয় এদেশ থেকে সরব নয় এদেশকে সারব"। এতে আমাদের দু দলই ভয় খেয়ে গেছেন। চীৎকার এঁদের সুরু হলে যে আমাদের সারা হয়, তার পরিচয় ত পূর্ব্বেও পেয়েছি। এর কারণও বেশ স্পষ্ট। কেননা প্রথমতঃ এঁরা গাইবেন বীররসের গান, আর আমরা করুণরসের; দ্বিতীয়তঃ এদের গলার জোর আমাদের চাইতে ঢের বেশী; তৃতীয়তঃ এঁরা সকলে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে পারেন—

যা আমরা মোটেই পারি নে। সুতরাং এ আশঙ্কা অসঙ্গত নয় যে, এঁদের বিরাট harmony-র ভিতর আমাদের স্বরাটের melody শোনাই যাবে না—বিশেষতঃ যখন ইংরেজ-কাগজওয়ালাদের জর্ম্মাণ ফুফুব্যাণ্ড গাল ফুলিয়ে দিন নেই রাত নেই এঁদের সঙ্গত কর্‌বে।

মনু বলেছেন ভারতবর্ষে চারটি মাত্র বর্ণ আছে,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—কিন্তু নাস্তি পঞ্চমঃ। এ ত সেকালের কথা। একালে ভারতবর্ষে, চন্দ্রের দুই পক্ষের মত সবে দুটিমাত্র বর্ণ আছে,—কালো আর সাদা; এ সত্যটা আমরা ভুলে যাচ্ছিলুম বলে এই বে-সরকারী ইংরেজের দল সেটি আবার আমাদের কানে ধরে মনে করিয়ে দিয়েছেন। এর পর কালোর ভিতর দুটি পক্ষের সৃষ্টি শুধু দৃষ্টির অভাব থেকেই সম্ভব হয়।

এ অবস্থায় আশা করা যায় যে, কংগ্রেসের দুটি ভাঙ্গাদল আবার জোড়া লাগবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে—কেমন করে? আমি বলি, তোমরা যা করে ভেঙ্গেছিলে, আবার তাই করে জোড় লাগাও,—অর্থাৎ না ভেবেচিন্তে। বিচ্ছেদ ঘটেছিল রাগের মাথায়—মিলন ঘটুক অনুরাগের ক্রোড়ে। অনুরাগ যে স্বভাবতঃই রাগের অনুসরণ করে, তার পরিচয় ত তার উপসর্গেই পাওয়া যায়।

"খণ্ডিতার" পুনর্মিলন ঘটাতে হলে অবশ্য কিঞ্চিৎ সাধ্যসাধনার আবশ্যক। এ সাধাসাধি একটু বেশী করেই কর্‌তে হবে, কেননা যাদের বাইরে মান নেই তাদের যে ঘরে অভিমান বেশী—এ সত্য ত জগদ্বিখ্যাত; আর তা ছাড়া এ কার্য্য নবীনদের পক্ষে করাই সঙ্গত, কেননা অতীতের প্রতি ভক্তি ত আমাদের সহজ ধর্ম্ম। তবে প্রবীণদের প্রতি আমার সানুনয় অনুরোধ এই যে, মানভঞ্জনের পালাটা যেন বেশী লম্বা না করেন। নইলে আমাদের রাজনীতির মিলনান্ত নাটক চাই কি বিয়োগান্ত প্রহসন হয়ে উঠতে পারে।

বাজারে গুজব যে, প্রবীণদল যেমন অভ্যর্থনা সমিতি হতে পালিয়ে এ যাত্রা নবীন দলের হাত থেকে বেঁচেছেন—তেমনি তাঁরা চেষ্টায় আছেন যে, বাঙ্গলা থেকে পালিয়ে এ যাত্রা কংগ্রেসকে বাঁচাবেন। কংগ্রেস ঠাঁই-নাড়া হলেই যে তাজা হয়ে উঠবে, তার কোনই সম্ভাবনা নেই। স্বরাটের নাম শুনলেই আমার সুরাটের কথা মনে পড়ে। দেশ যে একটু বেসামাল হলেই সুরট হয়ে ওঠে—যাঁর কিছুমাত্র রাগের জ্ঞান আছে, তিনিই তা জানেন। এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আক্কেলে ইসারা বাস্।

এই গৃহবিবাদের মূলে একটা ভুল ধারণা আছে। দুপক্ষই মনে করছেন যে, তাঁরা কে কি বলেন তার উপরই ভারতবর্ষের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এ হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড ভ্রান্তি! ব্রিটীশ-সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষের স্থান যে কোথায়, সে সমস্যা আজ শুধু ঘরের সমস্যা নয়—

বাইরেরও সমস্যা। এবং এ সমস্যার মীমাংসায় ঘরের চাইতে বাইরের হাত বেশী থাকবে। কেননা যে সকল পলিটিকাল কূপ-মণ্ডুকদের দৃষ্টি ঘরের দেওয়ালেই আবদ্ধ, তাঁদের কাকলিও ঘরের বাইরে যায় না। ভারতবর্ষের ভাগ্য যে প্রসন্ন হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই—কিন্তু তার ভিতর বিধাতার হাত আছে। ধর্ম্মের ঢাক আকাশে বাজে, কিন্তু সংসারের হট্টগোলে তার আওয়াজ আমরা বারোমাস শুনতে পাই নে। আজকের দিনে আকাশজুড়ে ধর্ম্মের জয়-ঢাক বেজে উঠেছে,এবং তার ধ্বনি বিশ্বমানবের কানে এসে পৌঁচেছে—এমন কি কোটী কোটী ভারতবাসীরাও তা শুনতে পেয়েছে,—কেননা তারা মূক হলেও বধির নয়। এই হচ্ছে একমাত্র আশার কথা। জাতীয় জীবনের একটি বিরাট পর্ব্ব তখনই রচিত হয়, যখন জাতির মনে একটি নূতন সত্যের আবির্ভাব হয়। এ ক্ষেত্রে বিশ্বমানব যে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেছে, সে হচ্ছে এই যে,—মানুষের সঙ্গে মানুষের আসল সম্পর্কটা হচ্ছে ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক, দাস ও প্রভুর নয়। এই সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে নবযুগের ধর্ম্ম। এই যুগ-ধর্ম্মের সাধনায় সকলকেই চাই, অথচ কাউকেও চাই নে;—অতএব সকলে এক হও, একলা সকল হতে চেষ্টা করো না।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭।

বীরবল।

আমার ধর্ম্ম।

—*—

সকল মানুষেরই "আমার ধর্ম্ম" বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটাকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খৃষ্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে-ধর্ম্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে সে হয় ত সত্য তা নয়। নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্ম্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না।

কোন্ ধর্ম্মটি তার? যে-ধর্ম্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি করে তুল্‌চে। জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণ-ধর্ম্ম। সেই প্রাণধর্ম্মটির কোনো খবর রাখা জন্তুর পক্ষে দরকারই নেই। মানুষের আর-একটি প্রাণ আছে সেটা শারীর প্রাণের চেয়ে বড়—সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনী-শক্তিই হচ্চে তার ধর্ম্ম। এই জন্যে আমাদের ভাষায় ধর্ম্ম শব্দ খুব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের জলত্বই হচ্চে জলের ধর্ম্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্চে আগুনের ধর্ম্ম। তেমনি মানুষের ধর্ম্মটিই হচ্চে তার অন্তরতম সত্য।

মানুষের প্রত্যেকের মধ্যে সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে আবার সেই সঙ্গে তার একটি বিশেষরূপ আছে। সেইটেই হচ্চে তার বিশেষ ধর্ম্ম। সেইখানেই সে-ব্যক্তি সংসারের বিচিত্রতা রক্ষা করচে। সৃষ্টির পক্ষে এই বিচিত্রতা বহুমূল্য সামগ্রী। এইজন্যে এ'কে সম্পূর্ণ নষ্ট

করবার শক্তি আমাদের হাতে নেই। আমি সাম্যনীতিকে যতই মানিনে কেন তবু অন্য সকলের সঙ্গে আমার চেহারার বৈষম্যকে আমি কোনো-মতেই লুপ্ত করতে পারিনে। তেমনি সাম্প্রদায়িক সাধারণ নাম গ্রহণ করে' আমি যতই মনে করি না কেন যে, আমি সম্প্রদায়ের সকলেরই সঙ্গে সমান ধর্ম্মের, তবু আমার অন্তর্য্যামী জানেন মনুষ্যত্বের মূলে আমার ধর্ম্মের একটি বিশিষ্টতা বিরাজ করচে। সেই বিশিষ্টতাতেই আমার অন্তর্য্যামীর বিশেষ আনন্দ।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেচি যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটা আমার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম—সেই সাধারণ পরিচয়েই লোকসমাজে আমার ধর্ম্মগত পরিচয়। সেটা যেন আমার মাথার উপরকার পাপড়ি। কিন্তু যেটা আমার মাথার ভিতরকার মগজ, যেটা অদৃশ্য, যে-পরিচয়টি আমার অন্তর্যামীর কাছে ব্যক্ত, হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ যদি বলে তার উপরকার প্রাণময় রহস্যের আবরণ ফুটো হয়ে সেটা বেরিয়ে পড়েছে, এমন কি তার উপাদান বিশ্লেষণ করে তাকে যদি বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ করে দেয় তাহলে চম্‌কে উঠ্‌তে হয়।

আমার সেই অবস্থা হয়েচে। সম্প্রতি কোনো কাগজে একটি সমা-লোচনা বেরিয়েচে তাতে জানা গেল আমার মধ্যে একটি ধর্ম্মতত্ত্ব আছে, এবং সেই তত্ত্বটি একটি বিশেষ শ্রেণীর।

হঠাৎ কেউ যদি আমাকে বল্‌ত আমার প্রেতমূর্ত্তিটা দেখা যাচ্চে তাহলে সেটা যেমন একটা ভাবনার কথা হত এও তার চেয়ে কম নয়। কেননা মানুষের মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ না হলে প্রেতলীলা সুরু হয় না। আমার প্রেতটি দেখা দিয়েছে এ কথা বল্লে এই বোঝায় যে, আমার বর্ত্তমান আমার পক্ষে আর সত্য নয় আমার অতীতটাই আমার পক্ষে

একমাত্র সত্য। আমার ধর্ম্ম আমার জীবনেরই মূলে। সেই জীবন এখনো চল্‌চে—কিন্তু মাঝে থেকে কোনো এক সময়ে তার ধর্ম্মটা এম্‌নি থেমে গিয়েচে যে, তার উপরে টিকিট মেরে তাকে জাদুঘরে কৌতূহলী দর্শকদের চোখের সম্মুখে ধরে রাখা যায় এই সংবাদটা বিশ্বাস করা শক্ত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অন্য-একটি কাগজে অন্য-একজন লেখক আমার রচিত ধর্ম্মসঙ্গীতের একটি সমালোচনা বের করেছিলেন। তাতে বেছে বেছে আমার কাঁচা বয়সের কয়েকটি গান দৃষ্টান্ত স্বরূপ চেপে ধরে তিনি তাঁর ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গড়ে তুলে ছিলেন। যেখানে আমি থামি নি সেখানে আমি থেমেচি এমন ভাবের একটা ফোটোগ্রাফ তুল্‌লে মানুষকে অপদস্থ করা হয়। চল্‌তি ঘোড়ার আকাশে-পা-তোলা ছবির থেকে প্রমাণ হয় না যে, বরাবর তার পা আকাশেই তোলা ছিল এবং আকাশেই তোলা আছে। এইজন্যে চলার ছবি ফোটোগ্রাফে হাস্যকর হয়, কেবলমাত্র আর্টিষ্টের তুলিতেই তার রূপ ধরা পড়ে।

কিন্তু কথাটা হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নয়। হয়ত যার মূলটা চেতনার অগোচরে তার ডগার দিকের কোনো-একটা প্রকাশ বাইরে দৃশ্যমান হয়েচে। সেই রকম দৃশ্যমান হবামাত্র বাইরের জগতের সঙ্গে তার একটা ব্যবহার আরম্ভ হয়েচে। যখনি সেই ব্যবহার আরম্ভ হয় তখনি জগৎ আপনার কাজের সুবিধার জন্যে তাকে কোনো-একটা বিশেষ শ্রেণীর চিহ্নে চিহ্নিত করে তবে নিশ্চিন্ত হয়। নইলে তার দাম ঠিক করা বা প্রয়োজন ঠিক করা চলে না।

বাইরের জগতে মানুষের যে পরিচয় সেইটেতেই তার প্রতিষ্ঠা। বাইরের এই পরিচয়টি যদি তার ভিতরের সত্যের সঙ্গে কোনো অংশে না

মেলে তাহলে তার অস্তিত্বের মধ্যে একটা আত্মবিচ্ছেদ ঘটে। কেননা মানুষ যে কেবল নিজের মধ্যে আছে তা নয়, সকলে তাকে যা জানে সেই জানার মধ্যেও সে অনেকখানি আছে। আপনাকে জানো এই কথাটাই শেষ কথা নয় আপনাকে জানাও এটাও খুব বড় কথা। সেই আপনাকে জানাবার চেষ্টা জগৎজুড়ে রয়েচে। আমার অন্তর্নিহিত ধর্ম্মতত্ত্বও নিজের মধ্যে নিজেকে ধারণ করে রাখতে পারে না—নিশ্চয়ই আমার গোচরে ও অগোচরে নানা রকম করে বাইরে নিজেকে জানিয়ে চলেচে।

এই জানিয়ে চলার কোনোদিন শেষ নেই। এর মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে তাহলে মৃত্যুর পরেও শেষ হবে না। অতএব চুপ করে গেলে ক্ষতি কি এমন কথা উঠতে পারে। নিজের কাব্যপরিচয় সম্বন্ধে ত চুপ করেই সকল কথা সহ্য করতে হয়। তার কারণ, সেটা রুচির কথা। রুচির প্রমাণ তর্কে হতে পারে না। রুচির প্রমাণ কালে। কালের ধৈর্য্য অসীম, রুচিকেও তার অনুসরণ করতে হয়। নিজের সমস্ত পাওনা সে নগদ আদায় করবার আশা করতে পারে না। কিন্তু যদি আমার কোনো একটা ধর্ম্মতত্ত্ব থাকে তবে তার পরিচয় সম্বন্ধে কোনো ভুল রেখে দেওয়া নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করা। কারণ যেটা নিয়ে অন্যের সঙ্গে ব্যবহার চল্‌চে, যার প্রয়োজন এবং মূল্য সত্যভাবে স্থির হওয়া উচিত, সেটা নিয়ে কোনো যাচনদার যদি এমন কিছু বলেন, যা আমার মতে সঙ্গত নয় তবে চুপ করে গেলে নিতান্ত অবিনয় হবে।

অবশ্য একথা মানতে হবে যে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার যা-কিছু প্রকাশ সে হচ্চে পথ-চল্‌তি পথিকের নোট-বইয়ের টোঁকা কথার

মত। নিজের গম্যস্থানে পৌঁছে যাঁরা কোনো কথা বলেচেন তাঁদের কথা একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁরা নিজের কথাকে নিজের বাইরে ধরে রেখে দেখতে পান। আমি আমার তত্ত্বকে তেমন করে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি নি। সেই তত্ত্বটি গড়ে উঠতে উঠতে বেড়ে চল্‌তে চল্‌তে নানা রচনায় নিজের যে-সমস্ত চিহ্ন রেখে গেচে সেইগুলিই হচ্চে তার পরিচয়ের উপকরণ। এমন অবস্থায় মুস্কিল এই যে, এই উপকরণগুলিকে সমগ্র করে তোলবার সময় কে কোন্‌গুলিকে মুড়োর দিকে বা ল্যাজার দিকে কেমন করে সাজাবেন সে তাঁর নিজের সংস্কারের উপর নির্ভর করে।

অন্যে যেমন হয় তা করুন কিন্তু আমিও এই উপকরণগুলিকে নিজের হাতে জোড়া দিয়ে দেখতে চাই এর থেকে কোন্ ছবিটি ফুটে বেরয়।

কথা উঠেছে আমার ধর্ম্ম বাঁশির তানেই মোহিত; তার ঝোঁকটা প্রধানত শান্তির দিকেই, শক্তির দিকে নয়। এই কথাটাকে বিচার করে দেখা আমার নিজের জন্যেও দরকার।

কারো কারো পক্ষে ধর্ম্ম জিনিসটা সংসারের রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার ভদ্র পথ। নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে এমন একটা ছুটি নেওয়া যে-ছুটিতে লজ্জা নেই, এমন কি, গৌরব আছে। অর্থাৎ সংসার থেকে জীবন থেকে যে-যে অংশ বাদ দিলে কর্ম্মের দায় চোকে, ধর্ম্মের নামে সেই সমস্তকে বাদ দিয়ে একটা হাঁফ ছাড়তে পারার জায়গা পাওয়াকে কেউ কেউ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মনে করেন। এঁরা হলেন বৈরাগী। আবার ভোগীর দলও আছেন। তাঁরা সংসারের কতক-

গুলি বিশেষ রসসম্ভোগকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে চোলাই করে নিয়ে তাই পান করে জগতের আর-সমস্ত ভুলে থাকতে চান। অর্থাৎ এক দল এমন-একটি শান্তি চান, যে-শান্তি সংসারকে বাদ দিয়ে, আর অন্য দল এমন একটি স্বর্গ চান যে-স্বর্গ সংসারকে ভুলে গিয়ে। এই দুই দলই পালাবার পথকেই ধর্ম্মের পথ বলে মনে করেন।

আবার এমন দলও আছেন যাঁরা সমস্ত সুখ দুঃখ সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব-সমেত এই সংসারকেই সত্যের মধ্যে জেনে চরিতার্থতা লাভ করাকেই ধর্ম্ম বলে জানেন। সংসারকে সংসারের মধ্যেই ধরে দেখলে তার সেই পরম অর্থটি পাওয়া যায় না যে-অর্থ তাকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত করে' এবং সকল দিকে অতিক্রম করে' বিরাজ করচে। অতএব কোনো অংশে সত্যকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু সর্ব্বাংশে সেই সত্যের পরম অর্থটিকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা ধর্ম্ম বলে জানেন।

ইস্কুল পালানোর দুটো লক্ষ্য থাকতে পারে। এক, কিছু না করা, আর-এক, মনের মত খেলা করা। ইস্কুলের মধ্যে যে-একটা সাধনার দুঃখ আছে সেইটে থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই এমন করে প্রাচীর লঙ্ঘন, এমন করে দরোয়ানকে ঘুষ দেওয়া। কিন্তু আবার ঐ সাধনার দুঃখকে স্বীকার করবারও দু'রকম দিক আছে। একদল ছেলে আছে তারা নিয়মকে শাসনের ভয়ে মানে, আরেক দল ছেলে অভ্যস্ত নিয়ম পালনটাতেই আশ্রয় পায়—তারা প্রতিদিন ঠিক দস্তুরমত ঠিক সময়মত উপরওয়ালার আদেশমত যন্ত্রবৎ কাজ করে' যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হয় এবং তাতে যেন একটা-কিছু লাভ হল বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। কিন্তু এই দুই দলেরই ছেলে নিয়মকেই চরম বলে দেখে—তার বাইরে কিছুকে দেখে না।

কিন্তু এমন ছেলেও আছে ইস্কুলের সাধনার দুঃখকে স্বেচ্ছায়, এমন কি, আনন্দে যে গ্রহণ করে, যেহেতু ইস্কুলের অভিপ্রায়কে সে মনের মধ্যে সত্য করে উপলব্ধি করেচে। এই অভিপ্রায়কে সত্য করে জানচে বলেই সে যে-মুহূর্ত্তে দুঃখকে পাচ্চে সেই মুহূর্ত্তে দুঃখকে অতিক্রম করচে, যে-মুহূর্ত্তে নিয়মকে মানচে সেই মুহূর্ত্তে তার মন তার থেকে মুক্তি লাভ করচে। এই মুক্তিই সত্যকার মুক্তি, সাধনা থেকে এড়িয়ে গিয়ে মুক্তি হচ্চে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। জ্ঞানের পরিপূর্ণতার একটি আনন্দছবি এই ছেলেটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্চে বলেই উপস্থিত সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে সমস্ত দুঃখকে সমস্ত বন্ধনকে সে সেই আনন্দেরই অন্তর্গত করে জানচে। এ ছেলের পক্ষে পালানো একেবারে অসম্ভব। তার যে-আনন্দ দুঃখকে স্বীকার করে সে আনন্দ কিছু না করার চেয়ে বড়, সে-আনন্দ খেলা করার চেয়ে বড়। সে-আনন্দ শান্তির চেয়ে বড়, সে-আনন্দ বাঁশির তানের চেয়ে বড়।

এখন কথা হচ্চে এই যে, আমি কোন্ ধর্ম্মকে স্বীকার করি। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমি যখন "আমার ধর্ম্ম" কথাটা ব্যবহার করি তখন তার মানে এ নয় যে আমি কোনো একটা বিশেষ ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করেছি। যে বলে আমি খৃষ্টান সে যে খৃষ্টের অনুরূপ হতে পেরেচে তা নয়—তার ব্যবহারে প্রত্যহ খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধতা বিস্তর দেখা যায়। আমার কর্ম্ম, আমার বাক্য কখনো আমার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে চলে না এত বড় মিথ্যা কথা বল্‌তে আমি চাই নে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমার ধর্ম্মের আদর্শটি কি?

বাইরে আমার রচনার মধ্যে এর উত্তর নানা জায়গাতেই আছে। অন্তরেও যখন নিজেকে এই প্রশ্ন করি তখন আমার অন্তরাত্মা বলে—

আমিত কিছুকেই ছাড়বার পক্ষপাতী নই, কেননা সমস্তকে নিয়েই আমি সম্পূর্ণ।

"আমি যে সব নিতে চাইরে—
আপনাকে ভাই মেল্‌ব যে বাইরে।"

যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক্ তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত। অতএব, সামঞ্জস্য সত্যের ধর্ম্ম বলে বাদসাদ দিয়ে গোঁজামিলন দিয়ে একটা ঘরগড়া সামঞ্জস্য গড়ে তুল্‌লে সেটা সত্যকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। এক সময়ে মানুষ ঘরে বসে ঠিক করেছিল যে, পৃথিবী একটা পদ্মফুলের মত—তার কেন্দ্রস্থলে সুমেরু পর্ব্বতটি যেন বীজকোষ—চারিদিকে এক-একটি পাপড়ির মত এক-একটি মহাদেশ প্রসারিত। এ রকম কল্পনা করবার মূল কথাটা হচ্চে এই যে, সত্যের একটি সুষমা আছে—সেই সুষমা না থাক্‌লে সত্য আপনাকে আপনি ধারণ করে রাখ্‌তে পারে না। এ কথাটা যথার্থ। কিন্তু এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ করে' এবং অতিক্রম করে'—শিব যেমন সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিষকে পান করে' তবে শিব। তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে' পৃথিবীটি বস্তুতঃ যেমন,—অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেম্‌নি করেই জান্‌বার সাহস থাকা চাই। ছাঁট-দেওয়া সত্য এবং ঘরগড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরো বেশী, তাই আমি অসামঞ্জস্যকেও ভয় করি নে।

যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটি সহজেই শান্তিময়, কেননা এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, বিরোধ নেই, মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নেই। এই অবস্থা ঠিক শিশুকালেরই সত্য অবস্থা। তখন অন্তঃপুরের অন্তরালে শান্তি এবং মাধুর্য্যেরই দরকার। বীজের দরকার মাটির বুকের মধ্যে বিরাট পৃথিবীর পর্দ্দার আড়ালে শান্তিতে রস শোষণ করা। ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র ছায়ার ঘাত-প্রতিঘাত তখন তার জন্যে নয়। তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ধর্ম্মবোধের যে আভাস মেলে সে হচ্চে বৃহতের আস্বাদনে। এইখানে শিশু কেবল তাঁকেই দেখে যিনি কেবল শান্তং, তাঁরই মধ্যে বেড়ে ওঠে যিনি কেবল সত্যং।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ কেননা সেদিক থেকে কোনো চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনই ঘট্‌তে পারে না। কেননা আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটি বড় মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, বিশ্ব-মানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড়-আমির সঙ্গে আমরা মিল্‌তে চাই। সেইখানে আমরা আমাদের বড় পিতাকে, সখাকে, স্বামীকে, কর্ম্মের নেতাকে, পথের চালককে চাই। সেইখানে কেবল আমার ছোট-আমিকে নিয়েই যখন চলি তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়; তখন মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে হনন করতে থাকে, দুঃখ শোক এমন একান্ত হয়ে ওঠে যে, তাকে অতিক্রম করে কোথাও সান্ত্বনা দেখতে পাইনে, তখন

প্রাণপণে কেবলি সঞ্চয় করি, ত্যাগ করবার কোনো অর্থ দেখি নে, ছোট ছোট ছোট ঈর্ষাদ্বেষে মন জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে—তখন

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী।

এই বড়-আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগ্‌ল, অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে বাইরের আকাশে দেখা দিলে, তারই উপক্রম দেখি, "সোণার তরীর" "বিশ্বনৃত্যে"।

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা,
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।

টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

কিন্তু এতেও বাজনার সুর। যদিও এ সুর মন্দ্র বটে কিন্তু মধুর মন্দ্র। যাই হোক্, কবিতার গতিটা এখানে প্রকৃতির ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠ্‌চে। বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করচে। তাই ঐ কবিতাতেই আছে:—

ঐ কে বাজায় দিবস নিশায়
বসি অন্তর-আসনে
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর,
কেহ শোনে কেহ না শোনে।

অর্থ কি তার ভাবিয়া না পাই,
কত জ্ঞানী গুণী চিন্তিছে তাই,
মহান্ মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধা বিঘ্ন ভেদ করে দুর্গমবন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করচেন এখানে তাঁরি কথা দেখি। এখন হতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল।

কিন্তু বিরোধ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে-ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্চে সেই ঐক্যটি কি? সেই হচ্চে শিবং। এই যে মঙ্গল, এর মধ্যে একটা মস্ত দ্বন্দ্ব। অঙ্কুর এখানে দুইভাগ হয়ে বাড়্‌তে চলেচে, সুখ দুঃখ, ভালো মন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল, সেটি এক, সেটি শান্তং, সেখানে আলো আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধ্‌ল সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না। এই শিবকে জানার বেদনা বড় তীব্র। এইখানে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।" কিন্তু এই বড় বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্ম্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্ব-প্রকৃতির বৃহৎশান্তির মধ্যে তার গর্ভবাস। আমার নিজের সম্বন্ধে নৈবেদ্যের দুটি কবিতায় এ কথা বলা আছে।

১।

মাতৃস্নেহ-বিগলিত স্তন্যক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস,
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাব-রসরাশি
কৈশোর করেছি পান; বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম সুরে, প্রকৃতির বুকে
লালন-ললিত চিত্তে শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে; প্রভাত শর্ব্বরী সন্ধ্যা বধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা। আজি সেই ভাবাবেশ,
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়া থাকে দূরে
কোন দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে,—দাও চিত্তে বল,
দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্ম্মল।

২।

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলঙ্কার রাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি'
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু! তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।

কর মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলঙ্কার। ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

যে-শ্রেয় মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে দ্বন্দ্বের পথে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি "চিত্রায়" "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়েচে। বাঁশির সুরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ।

যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি ?
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসার সীমা !

মাধুর্য্যের যে শান্তি এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়। এ কবিতায় যার অভিসার সে কে ?

কে সে ? জানিনা কে ! চিনি নাই তারে,—
শুধু এইটুকু জানি,—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে

অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি ; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে ;
সর্ব্বপ্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জেলেছে সে হোম-হুতাশন,
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষপূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।

এর পর থেকে, বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্য্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে-আহ্বান এসে পৌঁছয়, সে ত বাঁশির ললিত সুরে নয়। তাই সেই সুরের জবাবেই আছে,—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্ত লোভাতুরা,
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে, শেষে নিতে চাস হরে
আমার যামিনী ?
জগতে সবারি আছে সংসার সীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,

কেন আসে মর্ম্ম ছেদি' সকল সমাপ্তি ভেদি'
তোমার আদেশ ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মত বাজে
তোমার আহ্বান !

এ আহ্বান এ ত শক্তিকেই আহ্বান ; কর্ম্মক্ষেত্রেই এর ডাক ; রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়—সেইজন্যেই এর শেষ উত্তর এই ঃ—

হবে হবে হবে জয়, হে দেবী, করিনে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব, রাণী,
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা,
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি
দীপ নিবিবে না।
কর্ম্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

আমার ধর্ম্ম আমার উপচেতন লোকের অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে চেতন লোকের আলোতে যে উঠে আসচে এই লেখাগুলি তারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন। সে চিহ্ন দেখলে বোঝা যায়

যে, পথ সে চেনে না এবং সে জানে না ঠিক কোন্ দিকে সে যাচ্চে। পথটা সংসারের কি অতিসংসারের তাও সে বোঝে নি। যাকে দেখতে পাচ্চে তাকে নাম দিতে পারচে না, তাকে নানা নামে ডাকচে। যে লক্ষ্য মনে রেখে সে পা ফেলছিল বারবার হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে দেখচে, আর-একটা দিকে কে তাকে নিয়ে চল্‌চে।

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে,
কভু বেদনার তমোগহ্বরে,
চিনিনা যে পথ সে পথের পরে
চলেছি পাগল বেশে।

এই আবছায়া রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে যে-একটি বোধ কবির সাম্‌নে ক্ষণে ক্ষণে চমক দিচ্ছিল, তার কথা তখনকার একটা চিঠিতে আছে, সেই চিঠির দুই এক অংশ তুলে দিই।

"কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখ্‌তে বল্‌চে,—কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সঙ্গীত শুনতে প্রবৃত্ত করচে, বাইরের সঙ্গে আমার সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুল্‌চে ?

* * * * *

আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম্ম পাই সে কখনই আমার ধর্ম্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্ম্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।"

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্ম্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চল্‌ল ততই পূর্ব্ব-জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগ্‌ল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কি রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল এই সময়কার বর্ষশেষ কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে:—

হে দুর্দ্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দ্দিকে
বাহিরায় ফল,—
পুরাতন-পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে।

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান,
সদ্যোজাত মহাবীর, কি এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জ্বলদর্চ্চি-রেখা।
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্দ্ধমুখে, পড়িতে জানিনা
কি তাহাতে লেখা।
হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন-রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান,
আমরা দাঁড়াব উঠে, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরাণ।
চাবনা পশ্চাতে মোরা, মানিবনা বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিবনা দিক্।
গণিবনা দিনক্ষণ, করিবনা বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

রাত্রির প্রান্তে প্রভাতের যখন প্রথম সঞ্চার হয় তখন তার আভাসটা যেন কেবল অলঙ্কার রচনা করতে থাকে। আকাশের কোণে কোণে মেঘের গায়ে গায়ে নানা রকম রং ফুটতে থাকে, গাছের মাথার

উপরটা ঝিকমিক্ করে, ঘাসে শিশিরগুলো ঝিল্‌মিল্ করতে সুরু করে,—সমস্ত ব্যাপারটা প্রধানত আলঙ্কারিক। কিন্তু তা'তে করে এটুকু বোঝা যায় যে রাতের পালা শেষ হয়ে দিনের পালা আরম্ভ হল। বোঝা যায় আকাশের অন্তরে অন্তরে সূর্য্যের স্পর্শ লেগেছে; বোঝা যায় সুপ্তরাত্রির নিভৃত গম্ভীর পরিব্যাপ্ত শান্তি শেষ হল, জাগরণের সমস্ত বেদনা সপ্তকে সপ্তকে মীড় টেনে এখনি অশান্ত সুরের ঝঙ্কারে বেজে উঠ্‌বে। এমনি করে ধর্ম্মবোধের প্রথম উন্মেষটা সাহিত্যের অলঙ্কারেই প্রকাশ পাচ্ছিল, তা মানস-প্রকৃতির শিখরে শিখরে কল্পনার মেঘে মেঘে নানা প্রকার রং ফলাচ্ছিল, কিন্তু তারই মধ্য থেকে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল যে, বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড শান্তি এবার বিদায় হল; নির্জ্জনে অরণ্যে পর্ব্বতে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ ফুরোল, এবারে বিশ্ব-মানবের রণক্ষেত্রে ভীষ্মপর্ব্ব। এই সময়ে বঙ্গদর্শনে "পাগল" বলে যে গদ্য প্রবন্ধ বের হয়েছিল সেইটে পড়লে বোঝা যাবে, কি কথাটা কল্পনার অলঙ্কারের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে।

"আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ, শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়, এইজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া, ভীত; আনন্দ, যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্য দিয়া আপন সৌন্দর্য্যকে উদার ভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে

বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুধাটুকুর জন্য সুখ তাকাইয়া বসিয়া থাকে, দুঃখের বিষকে আনন্দ অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এইজন্য কেবল ভালটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত, আনন্দের পক্ষে ভালমন্দ দুইই সমান।

"এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয়, তাহা থামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। * * নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপন খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখী এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইঁহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্য ইঁহার সুর নহে, বিষাণ বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্ব্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে।"

"* * * * * * আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ঙ্কর, তার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া, দেখা দেয়। সেই ভয়ঙ্কর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখ মিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহা-

ধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহা পুণ্য ও মহা পাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে-একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালমন্দ দুইয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্তআকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য কর, হে উন্মাদ, নৃত্য কর! সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি-যোজনব্যাপী নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়! যে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক!

আমাদের এই ক্ষ্যাপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে—সৃষ্টির মধ্যে ইঁহার পাগ্‌লামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অনির্ব্বচনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনি, রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।"

তার পরে আমার রচনায় বারবার এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েচে—জীবনে এই দুঃখ-বিপদ-বিরোধ-মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব।

কহ, মিলনের এ কি রীতি এই
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
তার সমারোহভার কিছু নেই,
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না!
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে পিছে কেহ ব'বে না?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবেনা রাঙা বরণ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবেনা ধরাতল,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ?

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কত মত ছিল আয়োজন
ছিল কত মত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্ববম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,

তাঁর বিষাণে ফুকারি' উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
* * * *
যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখ শয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধ-জাগরুক নয়নে,
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ
আমি ছুটিয়া আসিব, ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

"খেয়া"তে "আগমন" বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে-মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জ্জনের মত ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসচেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।

ওরে দুয়ার খুলে দে রে
বাজা শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেচে আজ
আঁধার ঘরের রাজা!
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক্ ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা!
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো
দুঃখ রাতের রাজা!

ঐ "খেয়া"তে "দান" বলে একটি কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই, যে, ফুলের মালা চেয়ে ছিলুম, কিন্তু কি পেলুম?

এ ত মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি!
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারি,
এ যে তোমার তরবারি!

এমন যে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে? শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়?

আজ্‌কে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ব আমি ভয়।

আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে'
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে'
রাখব পরাণময়।
তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

এমন আরো অনেক গান উদ্ধৃত করা যেতে পারে—যাতে বিরাটের সেই অশান্তির সুর লেগেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা মান্‌তেই হবে সেটা কেবল মাঝের কথা, শেষের কথা নয়। চরম কথাটা হচ্চে শান্তং শিবমদ্বৈতং। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হত তাহলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না—তাহলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়? তাই ত মানুষ তাঁকে ডাকচে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং—রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ—তার দ্বারা আমাকে রক্ষা কর। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্চে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে! রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে ত স্বপ্ন, সে সত্য নয়।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগব আমি,
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান॥

শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্য্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেচি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েচেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজচেন তাঁর সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ,—সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে

নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বল্লেন, তাঁর সত্যকার সাথী মিলেচে, কেননা ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করচে—সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত ;—অসীমের যে-দান সে নিজের মধ্যে পেয়েচে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করচে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করচে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করচে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জ্জন, এই দুঃখই ত তার শ্রী, এই ত তার উৎসব, এতেই ত সে শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেচে, আনন্দময় করেচে। বাইরে থেকে দেখলে এ'কে খেলা মনে হয় কিন্তু এ ত খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্য্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এই জন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে—ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেইই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই—ও ত গাছ-তলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।

"রাজা" নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তারপরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে-অগ্নিদাহ ঘটালে, যে-বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই ত তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে

দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করচে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য্য, তাতেই আনন্দ।

যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে-বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে', আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে'। যে-বোধে আমাদের মুক্তি, "দুর্গংপথস্তৎ-কবয়োবদন্তি"—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই করে' তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।

"মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু ?

দাদাঠাকুর। হাঁ, তুমি আমাকে চিন্‌বে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু ? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে ? তোমাকে কে মান্‌বে ?

দাদাঠাকুর। আমাকে মান্‌বে না জানি কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু ? তবে এই শত্রুবেশে কেন ?

দাদাঠাকুর। এই ত আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না, আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেচি।

আমি ত মনে করি আজ য়ুরোপে যে-যুদ্ধ বেধেচে সে ঐ গুরু এসেচেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহঙ্কারের প্রাচীর ভাঙ্‌তে হচ্চে। তিনি আস্‌বেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আস্‌বেন, তার জন্যে আয়োজন অনেক দিন থেকে চল্‌ছিল। য়ুরোপের সুদর্শনা যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিল—তাই ত হঠাৎ আগুন জ্বল্‌ল, তাই ত সাত রাজার লড়াই বেধে গেল—তাই ত যে ছিল রাণী তাকে রথ ছেড়ে, তার সম্পদ ছেড়ে, পথের ধূলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্চে।

এই কথাটাই গীতালির একটি গানে আছে:—

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে,
আরেক হাতে হার,
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার।
আসেনি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে নেবে জিতে
পরাণটি তোমার।
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার।

মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আস্‌চে জীবন মাঝে,
ও যে আসচে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে,
যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার॥

এই যে দ্বন্দ্ব—মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ; এই যে বিপরীতের বিরোধ, মানুষের ধর্ম্মবোধই যার সত্যকার সমাধান দেখ্‌তে পায়,—যে সমাধান পরম শান্তি, পরম মঙ্গল, পরম এক, এর সম্বন্ধে বারবার আমি বলেচি। শান্তিনিকেতন গ্রন্থ থেকে তার কিছু কিছু উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারত। কিন্তু যেখানে আমি স্পষ্টত ধর্ম্মব্যাখ্যা করেচি, সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বল্‌তেও পারি—সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যরচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়—সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। তাই কবিতা ও নাটকেরই সাক্ষ্য নিচ্চি।

জীবনকে সত্য বলে জান্‌তে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েচে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেচে, সে দেখ্‌তে পায়, যাকে সে ধরেচে সে মৃত্যুই নয়,—সে জীবন। যখন সাহস করে তার

সামনে দাঁড়াতে পারিনে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে-সর্দ্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দ্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্চে। ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্চে এই যে, যুবকেরা বসন্ত উৎসব করতে বেরিয়েচে। কিন্তু এই উৎসব ত শুধু আমোদ করা নয়, এ ত অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে' তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছন যায়। তাই যুবকেরা বল্লে,—আন্‌ব সেই জরা-বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে'। মানুষের ইতিহাসে ত এই লীলা, এই বসন্তউৎসব বারে বারে দেখ্‌তে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে' নির্জ্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নব বসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই ত য়ুরোপে চল্‌চে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলি খেলা আরম্ভ হয়েচে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্ত্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেচে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েচে। তাই ফাল্গুনীতে বাউল বল্‌চে ঃ—"যুগে যুগে মানুষ লড়াই করচে, আজ বসন্তের হাওয়া তারি ঢেউ। যারা মরে' অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারা পত্র পাঠিয়েচে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্চে, —আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেচি, আমরা ফুটে বেরিয়েচি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম, তাহলে বসন্তের দশা কি হত?"—বসন্তের কচি পাতায় এই যে পত্র, এ কা'দের পত্র? যে সব পাতা ঝরে গিয়েছে—তারাই মৃত্যুর

মধ্য দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েচে। তারা যদি শাখা আঁক্‌ড়ে থাক্‌তে পারত, তাহলে জরাই অমর হত—তাহলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হল্‌দে হয়ে যেত, সেই শুক্‌নো পাতার সর্ সর্ শব্দে আকাশ শিউরে উঠ্‌ত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আপন চির-নবীনতা প্রকাশ করে—এই ত বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে,—যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ করে' জীবন্মৃত হয়ে থাকে—প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

"চন্দ্রহাস। এ কি! এ যে তুমি! সেই আমাদের সর্দ্দার! বুড়ো কোথায়?

সর্দ্দার। কোথাও ত নেই।

চন্দ্রহাস। কোথাও না? তবে সে কি?

সর্দ্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের?

সর্দ্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের?

সর্দ্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখ্‌লে, তারা যে তোমাকে কতরকম মনে করলে তার ঠিক নেই। তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে—এখন মনে হচ্চে তুমি বালক,—যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম! এ ত বড় আশ্চর্য্য, তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম!"

মানুষ তার জীবনকে সত্য করে, বড় করে, নূতন করে পেতে চাচ্চে।

তাই মানুষের সভ্যতায় তার যে-জীবনটা বিকশিত হয়ে উঠ্‌চে, সে ত কেবলি মৃত্যুকে ভেদ করে। মানুষ বলেচে—

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে বারে বারে,
তারপরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

মানুষ জেনেচে—

নয় এ মধুর খেলা—
তোমায় আমায় সারা জীবন
সকাল সন্ধ্যাবেলা।
কতবার যে নিব্‌ল বাতি,
গর্জ্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা।
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া
বন্যা ছুটেচে,
দারুণ দিনে দিকে দিকে
কান্না উঠেচে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজ্‌ল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে,
নাইক অবহেলা॥

আমার ধর্ম্ম কি, তা যে আজো আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বল্‌তে পারি নে—অনুশাসন আকারে, তত্ত্ব আকারে কোন পুঁথিতে-লেখা ধর্ম্ম সে ত নয়। সেই ধর্ম্মকে জীবনের মর্ম্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, উদ্‌ঘাটিত করে, স্থির করে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্য্য-রসভোগ যে সেই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ কথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার করি,—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি—কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জ্জন-করা আনন্দ নয়, দুঃখকে আত্মসাৎ-করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ, তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই,—তাকে ত্যাগ করে নয়; তার যে অখণ্ড অদ্বৈতরূপ, তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে,—তাকে অস্বীকার করে নয়।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো,
সেই ত তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই ত তোমার ভালো।
পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েচে যেই গেহ
সেই ত তোমার গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ
সেই ত তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই ত তোমার দান,

মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই ত তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই ত তোমার ভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই ত আমার তুমি।

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। শান্তং শিবং অদ্বৈতং। য়িহুদী পুরাণে আছে—মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে না জয় করতে পেরেচি, সে স্বর্গ ত জ্ঞানের স্বর্গ নয়—তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়—তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

"গর্ভ ছেড়ে মাটির পরে
যখন পড়ে,
তখন ছেলে দেখে আপন মা'কে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি'
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি,
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদন খানি।"

তাই সেই অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আস্‌তেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘট্‌ল। সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ, জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা দুঃখ বেদনার মধ্যে নির্ব্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে, তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিট্‌তে পারে কোথায়?—অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে, সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে—জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে—অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্ম্ম-বোধের প্রথম অবস্থায় শান্তং—মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মত কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তারপরে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে,—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না,—সেই অবস্থায় শিবং, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্চে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা সঙ্গম। সেখানে অদ্বৈতং। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া, তা নয়—সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে-আনন্দ, সে ত দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্ম্মবোধের এই যে যাত্রা,—এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের

অধিকার লাভ করেচে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেচে। সে সাবিত্রীর মত যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেচে। সে স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েচে, তবেই অমৃত-লোককে আপনার করতে পেরেচে। ধর্ম্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে, এই অদ্বৈতে, অমৃতে, আনন্দে, প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি—তারা পারে যাবে কি করে? সেই জন্যেই ত মানুষ প্রার্থনা করে,—অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। "গময়" এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।

আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্ম্মতত্ত্ব থাকে, তবে সে হচ্চে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্ম্মবোধ, যে-প্রেমের একদিকে দ্বৈত, আরেক দিকে অদ্বৈত; একদিকে বিচ্ছেদ, আরেক দিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে, এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে। আমার ধর্ম্ম যে-আগমনীর গান গায়, সে এই ঃ—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক জয়!

তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়!
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক্ ক্ষয়!
তোমারি হউক জয়!
এস দুঃসহ, এস এস নির্দ্দয়,
তোমারি হউক জয়!
এস নির্ম্মল, এস এস নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়!
প্রভাতসূর্য্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক্ লয়!
তোমারি হউক জয়!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নয়।

তীরে তীরে নৌকা রেখে ভরানদী পাড়ি দেবার আশা পোষণ করা "ঠিক বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" নয়,—বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে এই সোজা কথাটা বোঝা কারো কারো পক্ষে ভারী শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলোচ্য বিষয় যখনই তাঁদের অপ্রীতিকর হয়ে ওটে, তখনই তাঁরা সামাজকে সামনে রেখে স্বচ্ছন্দে শস্ত্র-চালনা সুরু করেন! এতে তাঁদের রণ-কৌশল যথেষ্টই প্রকাশ পায়, কিন্তু পৌরুষ-একটুও না। মতামতের-আসরে সমাজকে শিখণ্ডীর আসনে নামিয়ে নিয়ে এলে তারও গৌরব বিশেষ বর্দ্ধিত হয় বলে' ত' মনে হয় না। কথায় কথায় "মাথার দিব্যি" দিলে অবিলম্বেই সেটা যেমন কথার-কথায় পরিণত হয়—আমাদের দেশে সাহিত্যের আসরে সমাজের দোহাই জিনিসটাও তেম্নি নিরর্থক হয়ে পড়েছে!

সমাজের দোহাইএর আরো একটা দিক আছে। দেশী বাজি-করেরা "ভানুমতী"র খেলা দেখাতে গিয়ে, প্রথমেই ঝুলি খুলে বের করে বসে—"আত্মারাম সরকারের হাড়"। সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে "নজরবন্দী" করবার পক্ষে সেইটেই নাকি তাদের ব্রহ্মাস্ত্র! আমাদের সাহিত্যের আসরে সম্প্রতি এম্নিধারা ভানুমতীর খেলার সূত্রপাত দেখা যাচ্ছে। জ্ঞাতসারেই হোক্, আর অজ্ঞাতসারেই হোক হিন্দু-সমাজের মুখবন্ধ দিয়ে আমরা পাঠক-সমাজের "নজর-বন্ধ" করি। এর ফলে পাঠকের নিরপেক্ষ আলোচনার স্পৃহা এবং অভিনিবেশের শক্তি

আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে!—সমালোচনার ক্ষেত্রে এমন ধারা ঐন্দ্রজালিক উপায় কখনো সাধু-সাহিত্য-সম্মত হতে পারে না!

সবারি মনে রাখা উচিত—সমাজ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়; উত্তরাধিকার সূত্রে সমাজের দেওয়ানী-সনন্দ কারো হাতেই ন্যস্ত হয় নি; সমাজ পেটেণ্টও নয়, লিমিটেড্ কোম্পানীও নয়।

মানুষ অবস্থার উত্তেজনায়, সুবিধার অনুরোধে সমাজ গড়ে। পারিপার্শ্বিক কারণপরম্পরায় ধীরে ধীরে সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত এবং অনুসৃত হয়। যূথবদ্ধ জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের সমাজের পার্থক্যই হয়েছে—তার পরিবর্ত্তনশীলতায়। মানুষের মন ত ইতরপ্রাণীর মনের মত কয়েকটা দানাবাঁধা সহজ বুদ্ধির সমাবেশ মাত্র নয়;—তার যে সম্ভাবনা অশেষ, পরিণতি অনন্তে! সেই জন্যেই ত' মানুষের সমাজের অভিব্যক্তির কখনো শেষ হয় না। কোনো সমাজের কোনো অনুশাসনই অপরিবর্ত্তনীয় হতে পারে না! যাঁরা সমাজকে মানুষের উপরে বসাবেন—তাঁরা চুলোর আগুনকে প্রশ্রয় দিয়ে চালে ওঠাবেন।—তাঁদের গৃহদাহ অনিবার্য্য। আমাদের দেশে কারো কারো ভাবের ঘরে এম্নি করেই আগুন লেগেছে!

সামাজিক অভিব্যক্তির ধারার উজান বেয়ে গেলে নিশ্চয়ই এমন সব ঘাটের সন্ধান পাওয়া যাবে—যা এখন নিতান্তই অঘাটা! ঘাটকে অঘাটা, অঘাটাকে ঘাট কে করেছে? যুগে যুগে সমাজ-শরীরে যে সব পরিবর্ত্তন-পরম্পরা সংঘটিত হয়েছে,—সে কার ইঙ্গিতে, কার অনুরোধে? সমাজ কিছু আর সৌর-জগতের অংশবিশেষ নয় যে, সামাজিক-জীবের সনাতন-জড়তা সত্ত্বেও, তার ঋতুপরিবর্ত্তন স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই সুসম্পন্ন হবে! মানুষের মনই ত' সমাজের পক্ষে

সোনার-কাঠি, রূপার কাঠি!—তার ঘাত-প্রতিঘাতেই ত' সমাজ-প্রকৃতিতে গ্রীষ্মের জ্বালা আর বর্ষার বিরহ, শীতের সন্ন্যাস আর বসন্তের উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে।

যখনই, যে কোনো কারণেই হোক না, কোনো সমাজের মানুষের মানসিক গতি স্থগিত হয়েছে, তখনই শুধু সে সমাজ স্থাবর হয়ে সহসা স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। মনের ফোয়ারা জমাট বেঁধে গেলে সমাজের স্রোত স্বভাবতঃই মরে আসে। সে অবস্থা উন্নতির পরিপন্থী!

সমাজকে উন্নতির অনুকূল রাখতে হলে সামাজিক মনের গতি সবদিকে অব্যাহত রাখতে হবে!—মনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও প্রসারিত করতে হবে;—এতে সমাজের প্রতিপত্তি কমে যাবে—এমন ভয় করলে চলবে না। বাছুর দুধ খেতে খেতে, গাভীর পদ-আস্ফালন আর শৃঙ্গ-তাড়না উপেক্ষা করেও, পরম আগ্রহভরে মাতৃস্তনে আঘাত দিয়ে নবাগত স্তন্য স্রোতের সদ্ব্যবহার করে থাকে। তাতে তার মাতৃভক্তি ক্ষুণ্ণ হয় কিনা বলা যায় না, তবে মায়ের অপত্য-স্নেহ যে কমে না সেটা ত' প্রত্যক্ষ সত্য! আমার বিশ্বাস সমাজ সম্বন্ধেও এ কথা খাটবে। আমাদের সমাজের পরিণতির সম্ভাবনা বহুবিধ এবং বহু বিস্তৃত। কিন্তু সে সবই যে আঘাতের অপেক্ষা রাখে। সময়োচিত আঘাতেই ত সমাজের প্রকৃত উদ্বোধন! এ কাজে যাঁরা বাধা দেবেন সমাজদ্রোহী—তাঁরা!

(২)

ভক্তির আতিশয্যে আমরা আমাদের সমাজকে যে ক্ষীণ আর ক্ষণভঙ্গুর মনে করি,—সেটা আমাদের কল্পনার দৈন্য অথবা অপবাদ

ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের মনের সামাজিকতা যতদিন থাকবে সমাজও ততদিন কোনো না কোনো আকারে থাকবেই!—এ জিনিস ভাঙ্গে না—কেবলি গড়ে, কেবলি বাড়ে! সমাজের কোনো একটা বিশেষ মূর্ত্তির পরে অহৈতুকী ভক্তি, কোনো এক বিশিষ্ট ধরণের রীতি নীতি, আচার ব্যবহারের পরে অন্ধ পক্ষপাত কখনো মনের স্বাভাবিক অবস্থার লক্ষণ নয়! বর্ত্তমানের পরে অসন্তোষ অতৃপ্তির ভিতরেই ত ভবিষ্যৎ সৃষ্টির বীজ নিহিত রয়েছে!

জগতের সমস্ত উন্নত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে যে "হারামনি"র অনুসন্ধিৎসা রয়েছে তা থেকে কেন আমরা আমাদের সমাজকে একঘরে করে রাখতে চাইব? আর, চাইলেই সে চেষ্টা কি সফল হবে? চোখ মেলে আমাদের সমাজের পানে চাইলেই ত সে ব্যর্থ চেষ্টার শত সহস্র নিদর্শন সর্ব্বত্র দেখতে পাবো! এ ব্যাপার এত স্পষ্ট—আর এর দৃষ্টান্ত এত প্রচুর যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে সে সব দেখাতে যাওয়ার মানে—পাঠকের দৃষ্টিশক্তির প্রতি অবিচার করা। হাতের কঙ্কন আরসিতে দেখে আর লাভ কি? শিক্ষিত পাঠক সরল ভাবে নিজের নিজের মন অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাবেন—তার ঘাটে ঘাটে পুরাতন সমাজের কত "সনাতন" বিধি-নিষেধের শব অন্ত্যেষ্টি সংকারের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে! তথাকথিত সমাজের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তাদের প্রতি আমাদের যে সামাজিক কর্ত্তব্য তা আমরা বরাবর উপেক্ষা করেই আস্‌ছি! ফলে আমাদের মনে যা মরে রয়েছে, কাজে তাই ভূত হয়ে নেমে আসে। বর্ত্তমান কালে, শিক্ষিত লোকের "সামাজিক নিষ্ঠা" মানে সুনিপুণ আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যাপারটাতে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে

সব সময়ে শাদা-চোখে এটা ধরা পড়ে না। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই এর সত্যতা সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না। আমরা প্রত্যেকেই বানান করছি "বিড়াল", আর সকলে মিলে উচ্চারণ করে আসছি—"মেকুর"। আমাদের সমাজের এ সদর-মফস্বল-রহস্য আর কতদিন চলবে?

বিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞদের মতে এই বৈষম্য নাকি অতীত যুগের নানা বিজাতীয় সংঘাত এবং অপঘাতের মাঝে আমাদের সমাজ আর সভ্যতার পক্ষে রক্ষা-কবচের কাজ করেছিল। (এই প্রসঙ্গে তাঁরা পাশ্চাত্য সংঘর্ষে নিগ্রো আর Red Indian-দের শোচনীয় পরিণামের উল্লেখ করতেও ছাড়েন না।—যেন তারা আমাদের, আর আমরা তাদের মাসতুত ভাই!) আমি সে কথা মানি নে। আমার মনে হয়, তাঁরা কার্য্যটাকে কারণ বলে' ভুল করেছেন। আমাদের সমাজে সদর-মফস্বলের বৈষম্য ছিল বলে' হিন্দু-সভ্যতা যে আজ জানে-প্রাণে বেঁচে আছে—সে কথা ঠিক নয়! হিন্দু-সভ্যতা বিজাতীয় সভ্যতার সংঘর্ষে একেবারে অভিভূত হয় নি বলেই—প্রাণে মরে নি বলেই—আমাদের সমাজে সদর মফস্বলের সৃষ্টি হয়েছে।—এটা একটা দৈব দুর্ঘটনা! হিন্দু-সভ্যতা চালাকী করে বাঁচে নি, বেঁচেছে গায়ের জোরে। তার মূলে যে অমৃত সঞ্চিত রয়েছে, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আর্য্য-সভ্যতার যে মহিয়সী বাণীর অনুরণন রয়েছে তারি সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবেই সে জর্জ্জরিত হয়েও জীবন হারায় নি।

একটা উপমা দিলেই বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হবে। আমি যদি হঠাৎ দোতালার ছাদ থেকে একেবারে মাটীতে পড়ে যাই—তাতে যদি আমার পুঁটি-মাছের প্রাণ বেরিয়েই যায়,—তাহলে ত সব দেনা-পাওনাই

চুকে গেল;—কিন্তু যদি আমার জীবনীশক্তি যথেষ্ট প্রাণবন্ত থাকে; সোজা কথায়, যদি আমার আরো কিছুদিন পরমায়ু লেখা থাকে—এবং পড়ে গিয়ে না মরে' আমি যদি হাত পা ভেঙ্গে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য হয়ে যাই; তাহলে বন্ধু-বান্ধবেরা নিশ্চয়ই খুব খুসী হবেন না। আর, এমন কথা মনে করাও সঙ্গত হবে না যে, হাত পা ভেঙ্গে গেছে বলেই প্রাণটা বেঁচেছে। দুর্ঘটনার লক্ষ্য ছিল প্রাণ, কিন্তু ও বস্তু আমাতে খুব সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত ছিল বলে দুর্ঘটনার ফল সে পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারে নি; হাত পায়ের পরে ঝাল মিটিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। হাত পা যে ভেঙ্গেছে তাতেও আমার বিশেষ হাত নেই; আর প্রাণটা যদি যেত তাতেও আমার কিছুই বলবার ছিল না। তবে ও বস্তু যে যায় নি সেটা হচ্ছে "আমার পিতৃ-পুরুষের বহু পুণ্যের জোর"! প্রাণটাই যদি যেত, তাহলে, হাত পা ভাঙ্গ্‌তো কার? প্রাণটা যায় নি বলেই ত হাত পা ভাঙ্গা অবস্থার দুর্গতি ভোগ করবার জন্যে রয়েছি—আমি!

আমরা যে আমাদের দেশকে, আমাদের সমাজকে, আমাদের মনকে বিদেশী, বিজাতি এবং বিধর্ম্মীর প্রভুত্ব থেকে মুক্ত রাখতে পারি নি—আমাদের সামাজিক কপটতা হচ্ছে তারি দণ্ড। প্রায়শ্চিত্তকে পৌরুষ বলে গরব করার চেয়ে হীনতা আর কি হতে পারে?—আমরা তাই করছি! এতে আমাদের প্রায়শ্চিত্তের সার্থকতা, তার উদযাপন অযথা বিলম্বিত হচ্ছে!

(৩)

মতামতের ঘনঘটার ভিতরে আর একটা জিনিসের বেশ প্রচুর এবং পর্য্যাপ্ত বর্ষণ আজকাল দেখা যাচ্ছে।—"শান্তির বারি" নয়,

সেটা হচ্ছে সংযমের বক্তৃতা। সবুজ-দমনে সঙ্গীন-হস্ত সম্প্রদায়ের মুখে সংযমের বক্তৃতা সাজে ভালো, ছোটে খুব! বোধ হয় এই জন্যেই তাঁদের মুখের সংযমের বক্তৃতার কার্য্যকারিতা "শান্তির বারি"র চাইতে শিলাবৃষ্টির সঙ্গেই মেলে বেশী! তবু, এ কথার আলোচনা আমাদের কর্‌তেই হবে।

হতে পারে, সবুজের বিরুদ্ধে সংযমের অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু প্রবীণের পক্ষে জলে না নেমে সাঁতার কাটবার কল্পনা মনে স্থান দেওয়া যে নিতান্তই "মিথ্যাচার"—সে সম্বন্ধে আর দুই মত হতে পারে না।

যে কাজ করে, ভুল করবার সম্ভাবনা তার চিরদিনই থাকে। যে চলেছে মাঝে মাঝে পথভ্রষ্ট সে হয়েও থাকে। তাই বলে কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকাই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম? জাতীয়-জীবনে কর্ম্মের উদ্দীপনা এলে অধিকারের সীমা মাঝে মাঝে অনধিকারের রাজ্যে গিয়ে পড়বেই। তাই বলে বর্গীর ভয় দেখিয়ে, দেশের সব নবীন প্রাণকে ঘুম পাড়িয়ে রাখাই কি বুদ্ধিমানের উপদেশ? পাটোয়ারী হিসেবে লাভ লোকসান খতিয়ে দেখে, সংযম আর সংকল্পের পাইকারী দর যাচাই করে, উদ্দীপনার আমদানী রপ্তানী ভাবের হাটে কোনো দিনই সস্তবপর হয় না। এ কাজ কর্‌তে যাঁরা বিশেষ ভাবেই ব্যগ্র, কাজেই তাঁদের সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহ আসে—তাঁরা বুঝি কাজ না করবার ছুতো খুঁজতেই ব্যস্ত! উচ্ছ্বাস যেখানে নেই, সংযম সেখানে নিরর্থক। উপার্জ্জনের উন্মাদনা যেখানে কোনো কালেই ছিল না,—সঞ্চয়ের সংযম সেখানে কোন্ কাজে লাগবে? গ্রীষ্মের বিশ্বগ্রাসী রৌদ্রলীলাই ত পরবর্ত্তী বর্ষার মেঘ-মেদুর স্তব্ধতাকে সার্থক করে দেয়।

আমাদের সামাজিক প্রকৃতিতে শীতের শিশির শুকাতে না শুকাতেই যাঁরা বর্ষার জলের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সামাজিক প্রকৃতি থেকে যাঁরা বসন্তের উচ্ছ্বাস আর গ্রীষ্মের উদ্দীপনাকে নির্ব্বাসিত করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন;—আমার বিশ্বাস তাঁদের সেই অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা আর অসঙ্গত আশা কখনো সফল হবে না। কারণ শাস্ত্রে আছে,—কর্ম্ম থেকে যজ্ঞ, আর যজ্ঞ থেকেই পর্জ্জন্যের উৎপত্তি।

সামাজিক সংযমের সমালোচনা ব্যপদেশে আমরা প্রায়ই বলে থাকি—ব্যক্তিগত চিন্তা-স্রোতের স্বাধীন প্রবাহ অব্যাহত ভাবে চলতে থাকলে, আমাদের সামাজিক ঐক্য, পারিবারিক বন্ধন শ্লথ এবং শিথিল হয়ে, অচিরেই স্খলিত এবং বিধ্বস্ত হবে। এ সব শোচনীয় পরিণামের মর্ম্মভেদী বর্ণনা আমাদের লেখনী মুখে এমন জাজ্বল্যমান হয়ে ফুটে ওঠে,—পড়লে মনে হয় যেন এইমাত্রই লেখক তেমন একটা দেশ থেকে ফিরে আস্‌ছেন—যেখানে ভাই ভাইকে সম্মান করে না; বিদ্বান্ বুদ্ধিমানের ছেলে, স্বাধীন চিন্তার উত্তেজনায়, অবলীলাক্রমে বাপের গলায় ছুরি বসায়; মা স্বাধীনতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নবজাত শিশুকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়; হয়ত বা নবজাত শিশুও উত্তরাধিকার সূত্রে "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য" লাভ করে পূতনা বধের পুনরভিনয় করে থাকে। ব্যাপার গুরুতর বটে। কিন্তু ততোধিক গুরুতর আমাদের এই সর্ব্বজ্ঞতা। "সর্ব্বজ্ঞ" উপাধিটী লাভ করতে হলে, যে বিশেষ গুণটী আয়ত্ত করা দরকার, গত কয়েক শতাব্দী ধরে বিশেষ রকমেই তার চর্চ্চা হয়েছে—আমাদের দেশে। তারি ফলে উন্নতিশীল সভ্য-সমাজসমূহের সুধীসম্প্রদায় আজ যে সব

সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন,—আমাদের নখদর্পনেই আমরা তার সমাধান দেখতে পাচ্ছি। সেটী হচ্ছে আমাদের সনাতন শাস্ত্রীয় সালসা, আর তার সাথে দেশাচারের সহস্র অনুপান।

এ যেন শিশুর কান্নাকাটি থামাতে গিয়ে দুধের সাথে আফিমের প্রয়োগ। আমরা যাকে শান্তি বলি, প্রকৃত পক্ষে সেটা হচ্ছে সামাজিক সুষুপ্তি! এই যদি সামাজিক জীবনের চরম লক্ষ্য হতো,—তাহলে অবিশ্যি ও ব্যবস্থা খুবই সমীচিন এবং বিজ্ঞানসম্মত হতো! কিন্তু তা ত নয়। অন্নচিন্তা যার নেই এমন লোকের পক্ষেও পক্ষাঘাত খুব লোভনীয় হতে পারে না। সমস্যা-পরিশূন্য অবস্থাই ত সামাজিক জীবনের পক্ষে পক্ষাঘাত! এমন কোনো শাস্ত্রানুশাসন সূত্রের সমাহার কল্পনাতেই আনা যায় না, যাতে করে মানুষের ক্রমবিকাশশীল মনের সকল রকমের সমস্যারই সমাধান সম্ভবপর হয়।

এই অসম্পূর্ণতার ফাঁক দিয়েই ত যুগে যুগে মানুষের চিন্তা এবং সাধনা সমাজ-শরীরে প্রবেশ লাভ করেছে। যে দিন আমরা এ প্রবেশিকা বন্ধ করেছি—সেই দিন থেকেই আমাদের সমাজে সামাজিক উচ্চ-চিন্তার স্রোতও মরে এসেছে। আজ যে আমাদের সমাজজোড়া এত অশান্তি—এই যে নমঃশূদ্র তার জল চালাতে চায়, কৈবর্ত্ত আর ভাড়া খাটতে চায় না, বারুই যজ্ঞসূত্র ধারণের অধিকারের জন্যে ব্যগ্র—এ সবই ত সেই বন্ধ-দুয়ারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই যে "সবুজ" মনের উচ্ছৃঙ্খলতা, যার দমনে বঙ্গ-সাহিত্য আজ মুখর—তাও ত সেই বন্ধ-দুয়ারে তাদের বিরুদ্ধ মনের ঘাত প্রতিঘাত। এ চাঞ্চল্যের ভিতরে সমাজ-বিদ্বেষ নেই, আছে সমাজকে গতিশীল করবার আগ্রহ!

দেশে অরাজকতা বা যথেচ্ছাচারের প্রবর্ত্তনের সংকল্প মনে না এনেও, স্বরাজের আশা পোষণ করা যদি সম্ভব হয়, তবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচারের অবাধ প্রবাহ ছুটিয়ে দেবার কু-মৎলব না এঁটেও, সামাজিক উন্নতির চেষ্টা কষ্ট-কল্পনা বলে গণ্য হবে কেন? দেশের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে দেশবাসীর মনকে অসহিষ্ণু করে তোলবার চেষ্টা যদি দেশভক্তির পরিচয় হয়, তবে সমাজের হীনতা, অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে স্বজাতিকে সজাগ করবার চেষ্টা কোন্ যুক্তিবলে সমাজদ্রোহ বলে বিবেচিত হবে? রাজনৈতিক আলোচনায় নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপিয়ে, পরের প্রবলতার তলে নিজের দৌর্ব্বল্য চাপা দিয়ে নানান্ রকমের মুখরোচক প্রসঙ্গের অবতারণা করা যায়; আর সামাজিক সমালোচনায় সকল দোষ মাথা পেতে মেনে নিয়ে, পরে কর্ম্মক্ষেত্রে নামতে হয়। এই কারণেই কি এ বিষয়ে আমাদের এত বিরাগ? রাজনৈতিক আন্দোলনে পরের রাঁধা ভাতে বেগুন-সিদ্ধ দিয়েই, এ পর্য্যন্ত আমরা দেশের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য তা শেষ করে আসছি; কাজেই এখন সামাজিক ব্যাপারে, নিজের চুলিতে নিজে ফুঁ দেবার কথায় যে আমাদের চক্ষু রক্তবর্ণ হবে—তাতে বিশেষ আশ্চর্য্য হবার আর কি আছে?

(৪)

বহু যুক্তি তর্কের আড়ম্বর দিয়ে অনেক সময়ে আমরা আর একটা কথার অবতারণা করে থাকি। কান্ত-কবির তরজমায় সেটা হচ্ছে—"যা করবে আস্তে ধীরে—ঘা করো কেন খুঁচিয়ে"! এবম্বিধ আপত্তির মূলে রয়েছে আমাদের কর্ম্ম-বিমুখতা। সামাজিক গতি-শীলতা এতদিন

ধরে' বন্ধ থেকে আজ স্বতঃই যে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠ্‌বে—এমন আশা করবার কোনই সঙ্গত কারণ নেই! নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত এমন পরম-অভ্যস্ত প্রক্রিয়া আর মানুষের জীবনে কি আছে? তবু দু'-চার মিনিটের জলে-ডোবা মানুষের প্রাণ বায়ুর চলাচল আবার নিয়মিত কর্‌তে তার হাত-পা ধরে' কতই না সাধাসাধি কর্‌তে হয়।

জাপানে এ বেলা ওবেলা দু'বেলাই প্রায় ভূমিকম্প হয়; কাজেই জাপানীরা সেটাকে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ধরে' নিয়েই বাড়ী-ঘর তৈরী করে। আর আমাদের এখানে কালে ভদ্রে ভূমিকম্প হয়; আমরা ঘর-বাড়ী বানানোর সময় তা' নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামইনে। এই জন্যেই আমাদের দেশে ভূমিকম্প যখন হয়, তখন বেশ এক হাত দেখিয়েই যায়!—মুক্তপ্রাণ, গতিশীল সমাজের পক্ষে সংস্কার ব্যাপারটা নিত্য-নৈমিত্তিক; আর, আমাদের সমাজের পক্ষে সংস্কার হচ্ছে ভূমিকম্পের মতই স্মরণীয়! আমাদের সমাজের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ বহুদিন ধরে বন্ধ ছিল; আর, তাতে করে' আমাদের মনের অবস্থাটাও—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" ধরণের হয়ে গিয়েছে। আমাদের সামাজিক মনের নঙ্গর বহুকাল-সঞ্চিত পাঁকের নীচে এম্নি শক্ত হয়েই এঁটে বসেছে যে যথেষ্ট জোরজবরদস্তি ছাড়া এ ওঠ্‌বার নয়। কিন্তু এতে হাত দিলেই আমাদের বুকে বাজে! অভ্যাসের পাঁকটাকে আমরা সমাজের প্রাণবস্তু বলে' ভুল করি; পরগাছেকে আমরা গাছের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে' মনে করি! এই কারণেই আমাদের সমাজের প্রাণ ক্রমেই কোন-ঠাসা হয়ে যাচ্ছে, আর দেহ ক্রমেই রক্তশূন্য হয়ে পড়্‌ছে।

এ অবস্থার প্রতীকার চেষ্টা কি সমাজ দ্রোহ? দেশের সাম্‌নে

সমাজের দূষিত অংশ অনবগুণ্ঠিত করা কি দূষণীয়? দুঃসময়ে গ্রহ-বৈগুণ্যে সমাজে যে সব দোষ ঢুকেছে সে গুলিকে সামাজের অঙ্গীভূত হ'তে প্রশ্রয় না দিয়ে বিদূরিত কর্‌বার চেষ্টা করা কি সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা? আমার ত' মনে হয়, প্রত্যেক হিন্দুরই এটা কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। সমাজের "আসন্ন-বন্ধু"দের মতে এ কাজ যদি উচ্ছৃঙ্খল বলে' বিবেচিত হয়—তাহ'লে আমাদের মনে এ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়াই বর্ত্তমানে প্রয়োজন হয়েছে। আজ শৃঙ্খলিত অবস্থার প্রতি-ক্রিয়া হিসাবে, হয়ত, আমাদের মনের সদিচ্ছা কাজে উচ্ছৃঙ্খলতা হয়ে দাঁড়াবে;—কিন্তু পরিণামে শৃঙ্খল যখন টুটে যাবে, তখন স্বভাবতঃই সামাজে আবার শান্তির প্রবাহ চল্‌বে।

ত্রেতায় যুগাবতারের কর্ম্ম-জীবনের সূচনা হয়েছিল পাষাণী উদ্ধারে।—তাঁর পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যা নবজীবন লাভ করেছিল। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে নবযুগের সূচনা হয়েছে, আমাদের জাতীয় জীবনের অর্দ্ধস্ফুট উষার আকাশে, চক্রবালের কোলে কোলে, মেঘের নীচে যার আলোর রেখা মাঝে মাঝে ফুটে উঠে আমাদের সকলের মনকে নিয়ে এমন করে' খেলা কর্‌ছে তারও প্রথম কাজ হবে—পাষাণ উদ্ধার—অমাদের সামাজিক মনের শাপ—বিমোচন। আমাদের রাজনৈতিক জীবনের আদর্শ, আমাদের কর্ম্ম-জীবনের লক্ষ্য, আমাদের সাহিত্যিক জীবনের সাধনা যে আলোতে মণ্ডিত হয়ে, রঞ্জিত হয়ে, আজ আমাদের "আঁখির আগে" এসে দাঁড়িয়েছে, তারি সাম্‌নে উন্মুক্ত করে' দিতে হবে—আমাদের সামাজিক মনের সকল দুয়ার—সদর খিড়কি দুই-ই!

শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

আশ্বিন ১৩২৪।

দুখানি ফরাসী চিঠি।

—:*:—

সম্প্রতি এদেশের ইংরেজ খবরের-কাগজওয়ালারা রবীন্দ্রনাথের উপর নানারূপ কটু কথা প্রয়োগ করছেন। সে সব কথার মর্ম্ম এই যে, বিলাতের লোক যখন ভদ্রতা করে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রশংসা করেছেন, তখন এ দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলা তাঁর পক্ষে অভদ্রতা।—তারপর তিনি যখন কবি, তখন রাজনীতির চর্চ্চা তাঁর পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা।

ইউরোপ যে ভদ্রতার খাতিরে তাঁর কবিতার প্রশংসা করে নি, কিন্তু তা নিজগুণেই যে ইউরোপের শিরোধার্য্য হয়েছে, এবং কবিরও যে রাজনীতির অন্তত নীতি সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে,—তার প্রমাণস্বরূপ আমি দু'খানি ফরাসী পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

ইউরোপে যে খণ্ডপ্রলয় চলেছে, তার অবসানে মানবসমাজ যেখানে ছিল ঠিক সেইখানেই থাক্‌বে—এ বিশ্বাস শুধু অসাধারণ জড়মতি লোকের থাক্‌তে পারে। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের যে নব-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হবে, তার মধ্যে এসিয়ারও যথাযোগ্য স্থান থাক্‌বে, এবং এসিয়ার সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্ক অনেকটা ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্কের উপরেই নির্ভর কর্‌বে।—এসিয়া ও ইউরোপের এই ভাবী মিলনের বাণী, আসন্ন নবযুগের নববার্ত্তা ঘোষণা কর্‌তে পারবেন কবি,—

ব্যবসায়ী রাজনৈতিক নয়।—সুতরাং এ ক্ষেত্রে কবি একেবারে নীরব থাক্‌তে পারেন না।

চিঠি দু'খানি শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক কোনও বঙ্গযুবককে লিখিত।—একখানির লেখক একজন বেল্‌জিয়ান, অপরখানির একজন ফরাসী। প্রথম ব্যক্তির নাম Maeterlinck, দ্বিতীয়ের—Romain Rolland। এ দুই ব্যক্তির পরিচয় বাঙ্গালী পাঠককে দেওয়ার কোনও আবশ্যক নেই—আর আমার বিশ্বাস ইংরেজ খবরওয়ালারাও এঁদের অন্তত নামের সঙ্গে পরিচিত। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র পত্র দু'খানি অনুবাদ করে দিয়েছেন।

সম্পাদক।

Les Abeilles
Avenue des Beaumettes Nov. 1916.
Nice.

L'hommage de votre lettre, venu de si loin,—bien que dans toute la sincèrité de ma pensée, il dépasse beaucoup le mérite de mon effort,—m'a très profondement touché. J'ai surtout été heureux et fier d'apprendre que c'est votre grand poète Rabindra Nath Tagore qui a bien voulu me faire connaître parmi vous. Rien ne pouvait m'être plus sensible, car je considère certaines pages du "Gitanjali"—la seule de ses œuvres que je connaisse—comme les plus hautes, les plus profondes, les plus divinement humaines qu' on ait écrites jusqu'à ce jour.

MAETERLINCK.

[TRANSLATION OF M. MAETERLINCK'S LETTER.]

The tribute contained in your letter received from such a great distance, has touched me profoundly, although I sincerely believe it is out of all proportion to the merit of my work. I am, above all, happy and proud to learn that it is your great poet Rabindra Nath Tagore who has tried to make me known to you. Nothing could have affected me more deeply, for I consider certain pages of the "Gitanjali,"—the only one of his works that I know—the highest, the most profound, the most divinely human that have been written to this day.

Dimanche, 18 Mars, 1917.

Ami lointain, je vous remercie de votre sympathie. Je suis heureux que mon *Jean Christophe* ait trouvé dans votre cœur tant d'échos. Ce m'est une preuve de plus de la fraternité universelle des âmes. Cette fraternité, j'y crois, et je travaille a en établir la conscience profonde entre les hommes de tous les peuples, de toutes les races. Tout particulièrement, je sens, depuis quelques années, le besoin urgent de rapprocher l'esprit de l'Europe de celui de l'Asie. Ni l'un ni l'autre ne se suffit, à soi senl. Ce sont les deux hémisphères de la pensée. Il faut les réunir. Que ce soit la grande mission de l'age qui va venir! Si j'étais plus jeune, je m'y vouerais tout entier. Je me contente de la joie de goûter par avance la plénitude de la civilisation future, qui réalisera l'union des deux moitiés de l'âme humaine. J'admire votre Rabindra Nath Tagore, parceque je sens un peu en lui déjà vibrer cette harmonie.

Puissent mes yeux un jour boire (comme mon esprit) cette lumière de l'Inde, que je vois à travers vos lignes, lorsque vous décrivez la nature qui vous entoure.

Bien cordialement à vous,

ROMAIN ROLLAND.

Hotel Beauséjour, Champel, Genève (Suisse),
(faire suivre).

[Translation of M. Romain Rolland's Letter.]

Sunday, 18th March, 1917.

My far-away friend, I thank you for your sympathy. I am glad that my *John Christopher* has found so many echoes in your heart. It is one more proof to me of the universal fraternity of souls. I believe in this fraternity, and I strive to establish a deep consciousness of it in the minds of people of different countries and different races. I have been feeling especially for some years past, the urgent need of bringing the spirit of Europe into contact with the spirit of Asia. Neither the one nor the other is sufficient unto itself. They are the two hemispheres of thought. It is necessary to unite them. Let this be the grand mission of the age which is to come! If I were younger, I would dedicate myself entirely to this mission. I content myself with the joy of tasting in advance the plenitude of the civilization of the future, which will realise the union of these two halves of the human heart. I admire your Rabindra Nath Tagore, because I feel this harmony to some extent vibrating in him already.

May my eyes (like my spirit) one day drink this light of India, which I see through your lines, when you describe the nature which surrounds you!

Sincerely yours,

Romain Rolland.

Hotel Beauséjour, Champel,

Geneva (Switzerland).

গীতি-কবিতা।

—:*:—

যখন রেলওয়ে হয়নি, টেলিগ্রাফ হয়নি, খাওয়া পরার সংগ্রাম আজকার মতো এমন কঠিন হয়ে ওঠে নি, তখন মানুষের দিনটে আর মনটা ভরে থাকত অনেকখানি অবসর দিয়ে—আর সেইটে ছিল মহাকাব্যের যুগ। কোন গোলমাল নেই—দিব্যি নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত হয়ে লিখে যাও—সর্গের পর সর্গ, পর্ব্বের পর পর্ব্ব—ছাপাখানার তাগিদ্ নেই, পাঠকের "দেহি দেহি" রব নেই—শুধু লিখে যাও, যতদিন খুসি—দশ বছর, বিশ বছর পঁচিশ বছর ধরে লিখে যাও—শুধু লিখবারই আনন্দে রে। কিন্তু আজকাল যখন আমাদের খাওয়া পরা জোগাড় করতেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টা কেটে যায়—যখন জগতটা এমনি বেগে চলেছে যে, সেই চলার মাঝে কারও এমন সাধ্য নেই যে দু' দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকে—তা ছাড়া যখন ছাপাখানার উদর পূরণ করতে হবে—পাঠকদের মাসিক বরাদ্দটা মিটিয়ে দিতে হবে—তখন গীতি-কবিতাই হচ্ছে প্রশস্ত। কঠোর জীবন-সংগ্রামের মাঝে কোন রকমে একটু সময় করে নিয়ে গোটাকয় লাইনে ছন্দ তাল মান লাগিয়ে একটা কিছু লিখে ফেল—নইলে উপায় নেই—পরমুহূর্ত্তে কিসের ধাক্কায় যে কোথায় গিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। রাস্তায় চলতে চলতেই হয়ত গুন্ গুন্ করে একটা কিছু রচনা করে ফেললে—নইলে উপায় নেই—এমনিই কাল। তাই এইটে হচ্ছে গীতি-কবিতার যুগ।

কিন্তু তাই বলে যে মহাকাব্যের যুগে কেউ গীতি-কবিতা লিখলে সৃষ্টিটা ধ্বংস হয়ে যাবে কিম্বা গীতি-কবিতার যুগে মহাকাব্য লিখলে তাকে পিনাল কোডের ধারায় পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই।

কিন্তু ওটা গেল বাহিরের কথা। আর এটা বোধ হয় সবাই মানবেন যে মানুষের বাহিরটা দিয়ে তার ভিতরটা গড়ে ওঠে না—তার ভিতরটা দিয়েই তার বাহিরটা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই এর একটা ভিতরের কারণও আছে—যে কারণটাই হচ্ছে আসল কারণ। সে কারণটা হচ্ছে এই যে, মহাকাব্য লিখতে হলে লেখকের যে মানস-জগত চাই—যে mentality দরকার, মানুষ সেই মানস-জগত থেকে সরে পড়েছে—সেই mentality-টা সে হারিয়ে ফেলেছে।

মহাকাব্য লিখতে হলে যে-সব উপাদান দরকার সে-সব উপাদান আর মানুষের মনে প্রাণে অন্তরে মিলছে না। সেই বীরত্ব শূরত্ব শৌর্য্য বীর্য্য সেই classical heroism আর মানুষের প্রাণে নেই। বলছি না যে আজকার মানুষ ভীরু বা কাপুরুষ কিম্বা মরতে ভয় পায়। না, তবে যখন যুদ্ধটা চলে বুদ্ধি আর বিজ্ঞান দিয়ে—যেখানে দু' মাইল দূর থেকে একটা বোতাম টিপে দিলেম আর কামানটা ফায়ার হয়ে গেল, সেখানে সিংহবিক্রমের ততটা প্রয়োজন নেই যতটা আছে ঠাণ্ডা মাথার। আজকার মানুষও যে সাহসী সে সম্বন্ধে কোন ভুল নেই। কিন্তু তার সাহসটা কল-কব্জা দিয়ে এমনি করে নিয়মিত যে, সে-সাহস বুদ্ধির কোঠায় পড়ে একেবারে বেকার বসে আছে, তার প্রাণ অধিকার করে আর তার বীরমূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। আর যেটা প্রাণ দিয়ে অনুভব করা না যায় সেটা কলমের আগা দিয়েও বেরোয় না। যদি বা বেরোয় তবে সেটা মুখের কথা হয়েই

বেরোয়। আর মুখের কথার স্থান কাব্যে ত নেইই—আর যেখানেই থাক। মুখের কথায় চিড়ে যদি বা ভেজে—মানুষের মন ভেজে না কিছুতেই। আর ঐ শূরত্ব বীরত্ব heroism ছাড়া মহাকাব্য ভাল জমে না—এটা বোধ হয় সর্ব্ববাদীসম্মত। তাই মহাকাব্যের যুগ আর নেই।

এই ডেমোক্রেসির যুগে মানুষের মনের মধ্যে আর আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। যখন মেটারলিঙ্ক পড়ি তখন দেখি সেখানে রাজার কথায় আর রাজ-ভৃত্যের কথায় বড় বিশেষ তফাৎ নেই। ডেমোক্রেসির আবহাওয়াতে রাজাও আর রাজা নেই, রাজভৃত্যও আর রাজভৃত্য নেই। সেই আবহাওয়াতে বাস করে' লেখকের মন থেকেও রাজা আর রাজভৃত্যের ভেদ প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। লেখকের মনে প্রাণে যেটা নেই তার লেখায় সেটা জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না কিছুতেই—কারণ মানুষ মুখে যে কথাই বলুক না কেন তার আসল তাৎপর্য্য হচ্ছে তার অনুভবের ভিতরে। আর মহাকাব্য হচ্ছে প্রধানত হয় দেবরাজ্যের নয় আভিজাত্যের গান। শৌর্য্য বীর্য্য বীরত্ব ধীরত্ব গম্ভীরত্ব—সব বিষয়ে, ফরাসীতে যাকে বলে grandeur তাই সেখানে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলা চাই। নইলে মহাকাব্যের মহাকাব্যত্বই নষ্ট। তাই দায়ে পড়েই মহাকাব্যের যুগ চলে গেছে।

কিন্তু ওটা গেল অভাবের দিক—যে জন্যে মহাকাব্য আর লেখা হচ্ছে না তার negative side। উপরন্তু মানুষের একটা ভাবের দিক—positive side আছে যার গুণে গীতি-কবিতা লেখা চলছে। সেটা হচ্ছে এই যে মানুষ বুঝেছে যে তার ভিতরটা তার বাহিরটা থেকে বড়। সে আজ বাহিরের ঘটনাবলীকে দেখতে ততটা ভাল-

বাসে না যতটা ভালবাসে তার অন্তরের লীলা দেখতে। তাই আজ-কার কবির আর ভার্জিনের মতো Arma virumque cano—I sing of arms and heroes বলে সন্তোষ নেই—সে আজ চায়—

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভামাঝে—

সে আজ চায় অন্তরের এক একটী সুর ধরে, এক একটী অনুভব ধরে তারি মূর্ত্তি ছন্দে অর্থে তালে ফুটিয়ে তুল্‌তে। আর সে জন্যে গীতি-কবিতাই প্রশস্ত। তাই এটা হচ্ছে গীতি-কবিতার যুগ।

(২)

গীতি-কবিতা বলি সেইটেকে যেটার স্বরূপ হচ্ছে কিছুটা কবিতা আর বাকিটা গীত। গীতি-কবিতার উৎকৃষ্টতা নির্ভর করবে এর ওপরে যে সে কবিতার অর্থ কতখানি তার কথা গুলোকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে উঠেছে—ঠিক গানের মত। কারণ গীতি-কবিতার প্রাণ যেটা সেটা তার কথার অর্থের মধ্যে ততটা নেই যতটা আছে তার ভাবের সঙ্গীতের মধ্যে। ভাবের সঙ্গীত বলছি এই জন্যে যে, সঙ্গীত জিনিসটার মধ্যে কি শেষে কোন দাঁড়ি টানা নেই—অর্থাৎ গান জিনিসটার আরম্ভ থাক্‌লেও এর শেষের দিকটায় একটা dash একেবারে ad infinitum পর্য্যন্ত টানা। আর এই জন্যেই বোধ হয় উঁচুদরের গীতি-কবিতা অনেকের কাছে অস্পষ্ট বলে' মনে হয় এবং অনেকে

তা বস্তুতন্ত্রহীন মনে করেন কারণ ও জিনিসটাই এম্‌নি যে ওর মানে কোন খানেই শেষ হয় না। যে গীতি-কবিতাটা তার কথার সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও দাঁড়ি টেনে বসেছে সেটা অর্থ হিসেবে যতই স্পষ্ট হোক্ না কেন গীতি-কবিতা হিসেবে তার মান খর্ব্বই হবে। কারণ গীতি-কাবতার প্রাণই হচ্ছে ভাবের সঙ্গীত। আর সঙ্গীত জিনিসটার শেষের দিকে দাঁড়ি টানা নেই। এই কথাটা আরও একটু বিশদ করে' বলবার চেষ্টা কর্‌ব।

যখন বইটা খুলে' চোখ দুটো বুলিয়ে যাই
তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে আসে আসে!
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে আসে আসে।

তখন বেশ বুঝ্‌তে পারি যে ঐ চার লাইনের মধ্যে সব চাইতে যা উপভোগ কর্‌ছি সেটা হচ্ছে তার না—আসাটা। "সে যে আসে আসে আসে"র সঙ্গে সঙ্গে তার আসাটা বাস্তবিক শেষ হ'য়ে যায় নি এই হচ্ছে পাঠকের সবার চাইতে আরামের খবর। ঐ যে "আসে আসে আসে"র পরে ছাপায় দাঁড়ি থাক্‌লেও তাতে মনের পাতায় কোন দাঁড়ি পরে না সেইটেই হচ্ছে পাঠকের সবার চাইতে বড় লাভ—আর সেইটে হচ্ছে এর প্রাণ। "যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী সে যে আসে আসে আসে"; কত দীর্ঘ যে সে রাস্তা—সে যে কতদূরে—কোন দিগন্তের কোন পার থেকে যে সে আস্‌ছে—কোন্ অনন্তের ভিতর দিয়ে যে সে হেঁটে চলেছে—যে তাতে মনটাও একেবারে অনন্তের পথে উধাও হয়ে যায়—আর এইটেই হচ্ছে পাঠকের সবার চাইতে বড় লাভ।

কিন্তু "যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী" যে চলে' আস্‌ছে সে যদি হঠাৎ একদিন গোঁফে চাঁড়া দিয়ে এসে কবির সম্মুখে দাঁড়িয়ে যেত তবে সেটা আর গীতি-কবিতা থাক্‌ত না, সেটা হ'য়ে পড়্‌ত রয়টারের তারের খবর—একেবারে চাক্ষুষ, জাজ্বল্যমান, নিরেট অর্থযুক্ত,—আর তারপর যদি সে পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে' সেটা খেতে খেতে চাষ আবাদের খবর জিজ্ঞেস কর্‌ত তবে ত কথাই নেই—সেটা যে হ'ত ভীষণ ভাবে বস্তুতান্ত্রিক তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু গীতি-কবিতার তাতে লাভের চাইতে ক্ষতি হ'ত অনেক বেশী ; কিন্তু তার চাইতেও বেশী ক্ষতি হ'ত পাঠকদের। কেন ?—সেটা বল্‌ছি।

মানুষের অন্তরে দুটো সুরের তার রয়েছে। তার একটাতে বাজে সান্তের সুর আর একটাতে গুপ্ত হয়ে রয়েছে অনন্তের সুর। আমরা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর মধ্যে ঐ সান্ত সুরটাই নিশিদিন বাজিয়ে চলেছি। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে কারণে অকারণে সময়ে অসময়ে ঐ অনন্তের সুরটাও কারও কারও অন্তরে এক একবার করে' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। আর ঐ অনন্তের সুরটা মানুষের অন্তরে মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিয়ে এসেছে বলে' মানুষ আজকার যা তাই। নইলে সেই আদিম কালের অন্ধকার যুগে তীর ধনুক দিয়ে বন্য পশু শীকার কর্‌তে কর্‌তে তার হাতে কড়া পড়ে' যেত কিন্তু তার মনের গায়ে কোন দাগ পড়্‌বারই অবসর পেত না।

কেবল তাই নয়। এই অনন্তের সুর মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে বলে আমরা সাহস করে ভাবতে পারি যে বাস্তবিক আমরা তেমন বদ্ধজীব নই—আমাদের একটা মুক্তির দিকও আছে। এই যে রক্তমাংসের শরীর তা যতই নিরেট হোক না কেন, যতই চাক্ষুষ, যতই জাজ্বল্যমান, যতই শক্ত হোক না কেন, আমরা তার মধ্যেই শেষ হয়ে যাই নি। আমাদেরও একটা দিক আছে যে দিকটায় দিগন্তের বাতাস বয়ে যায়—অনন্তের আলো ছেয়ে যায়। এই দিকটা মানুষের অনন্ত আশার অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষার দিক। আর তার এই অফুরন্ত আশা আকাঙ্ক্ষার দিকটা আছে বলে হাজার হাজার যুগ কাটিয়ে এসেও মানুষের বাঁচা, আজও শেষ হয়ে যায় নি—অর্থশূন্য হয়ে যায় নি। আজও তার কত ভাববার কত করবার আছে। যেদিন মানুষ তার এই অনন্তের দিকের গোড়ায় এসে পৌঁছিবে—সেদিন থেকে তার বাঁচাটা হবে ঝক্‌মারি পূর্ব্ব-জীবনের জাবর কাটা—সেদিন আসবে মহাপ্রলয়—সেদিন সব মুছে ফেলে আবার মানুষকে সেই গোড়া থেকে সুরু কর্‌তে হবে।

এই যে অনন্তের দিক, মুক্তির দিক—এইটে হচ্ছে মানুষের বৃহত্তর আনন্দের দিক। এই বৃহত্তর আনন্দের দিকটা যার জীবনে যত বেশী প্রকাশ পেয়েছে মানবজন্ম তার তত বেশী সার্থক হয়েছে। কারণ "মানব" নামক যে সম্পাদ্য প্রতিজ্ঞাটী তার সাধারণ সূত্র হচ্ছে—

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।

আর তার স্বীকার্য্য (postulate) হচ্ছে—"রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি।"

বলেছি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সান্ত সুরটাই বাজিয়ে চলেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন—যাঁদের মধ্যে—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির জন্যেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক্—ঐ অনন্তের সুরটা অকারণেই বেজে ওঠে। আর এই সব লোকই

মানব সমাজে অন্যান্য লোক থেকে অসাধারণ হ'য়ে ওঠে! কেউ বা কবি, কেউ বা চিত্রকর, কেউ বা গায়ক কেউ বা আর একটা কিছু। কিন্তু আমরাও আমাদের অন্তরে মাঝে মাঝে ঐ অনন্তের ঝঙ্কার না শুন্‌লে প্রাণে বাঁচি নে। ঐ বৃহত্তর আনন্দের দিকটার মাঝে মাঝে গন্ধ না পেলে আমাদের অস্তিত্বটাকে সম্পূর্ণ করে' পাই নে—ঐ বৃহত্তর আনন্দের দিকটার হাওয়া মাঝে মাঝে প্রাণে না লাগ্‌লে আমাদের জীবনটা হয়ে ওঠে একঘেয়ে—দুর্ব্বিসহ। তাই কবিকে ডেকে বলি—হে কবি এমন কিছু লেখো যার ছন্দে অর্থে ঝঙ্কারে আমারও অন্তরে অনন্তের তারটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌বে। চিত্রকরকে ডেকে বলি—হে চিত্রকর এমন কিছু আঁকো যার রেখায় বর্ণে সৌন্দর্য্যে আমার অন্তরে যে অনন্তের ছবিখানি আছে তা মূর্ত্তি পাবে। গায়ককে বলি—হে গায়ক এমন কিছু গাও যার সুরে সুরে আমার হৃদয়ের অনন্তের সুরটাও পরতে পরতে খুলে যাবে। এই যে কবি চিত্রকর গায়ক প্রভৃতি—এঁরা মানুষকে তাদের এই সবার চাইতে অনির্ব্বচনীয় জিনিসটি পাইয়ে দেন বলে' লোকের কাছে তাঁদের এত সম্মান—সমাজ তাঁদের এমন ভক্তি শ্রদ্ধা করে। আমরা গীতি-কবিতার কাছথেকে ঐ অনির্ব্বচনীয় জিনিসটীই পাবার আকাঙ্খা করে' বসে' থাকি। যেন তার ছন্দ অর্থ সুর আমাদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে' সেখানে এমন একটা জগতের সৃষ্টি করে যে—জগতে আমি আমাকে পাই বৃহত্তর করে' মুক্ততর করে'—যেখান থেকে ভূমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌তে কোন রকম লজ্জা পাই নে। আর সেই জন্যেই বলছি যে গীতি-কবিতা যদি তার পাঠককে ঐ জিনিসটি পাইয়ে না দেয় তবে গীতি-কবিতার যত ক্ষতি হোক্ না হোক্ তার চাইতে বেশী ক্ষতি পাঠকদের। আর

গীতি-কবিতা পাঠককে ঐ জিনিসটী পাইয়ে দিতে পারে না—যদি না তার অর্থ তার কথাগুলোকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে যায়—যদি না তার শেষের দিকে একটা ভাবের dash একেবারে ad infinitum পর্য্যন্ত টানা থাকে।

অন্ততপক্ষে গীতি-কবিতার যে ক্ষুদ্র দেহ—সেই ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে একটা বৃহৎ হৃদয়ের—একটা গভীর হৃদয়ের পরিচয় থাকা চাই—যে হৃদয়ের সংস্বর্গে এসে পাঠক তার আপনার হৃদয়টারও বৃহত্ব গভীরত্ব টের পেয়ে যায়—নইলে গীতি-কবিতার অনেকখানিই ব্যর্থ।

ঠিক হোক্ বেঠিক হোক্ গীতি-কবিতা সম্বন্ধে এই কথাগুলোই মনে আস্‌ছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সনেট্।

কি ভাবিছ বসি পান্থ জীবন বেলায়
মুখে হাসি চোখে জল দৃষ্টি কত দূরে ?
সম্মুখে বিস্তৃত সিন্ধু, আশা নিরাশার
সহস্র ঊর্ম্মির খেলা ; আহ্বানের সুরে

কে সদা ইঙ্গিত করে নামিতে খেলায়
মথিয়া লহরীমালা দিতে সন্তরণ,—
কোথায় দেখেছ কারে ? কিসের আশায়
সংহত করেছ তব হৃদয় স্পন্দন ?

যাও যাও নামি যাও অজানার পানে
জীবন কৃতার্থ হবে উদ্যমে প্রয়াসে
ব্যর্থতাও তৃপ্ত হবে জীবনের গানে
শ্রান্ত হিয়া শান্তি পাবে নিবৃত্তি-নিবাসে ;—
আজি যদি রুদ্ধ কর অমৃতেরে ধরি'
জীবন উঠিবে শুধু হাহাকারে ভরি'।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।